বঙ্গ কমলবার্তা

পশ্চিমবঙ্গ দিবসের ইতিহাস

জুন সংখ্যা। ২০২৫

মোদী-শাহ ঝড়ে ভূমিকম্প বাংলায়

আহমেদাবাদে দুর্ঘটনাস্থল ঘুরে দেখার পর হাসপাতালে আহতদের সঙ্গে দেখা করতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ।

মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনার পর আহমেদাবাদ এয়ারপোর্টে উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

আহমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনায় প্রয়াত গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানির বাসভবনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বঙ্গ
কমলবার্তা

জুন সংখ্যা। ২০২৫

জন্মশতবর্ষে অটল বিহারী বাজপেয়ী ৪

মোদী-শাহ ঝড়ে ভূমিকম্প বাংলায় ৬
জয়ন্ত গুহ

অপারেশন সিঁদুরঃ মোদীর নতুন ভারতের বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ ৮
অভিরূপ ঘোষ

অপারেশন নকশাল-মুক্ত ভারত ১১
সৌভিক দত্ত

পিসি-তন্ত্রঃ স্বৈরতন্ত্র ও দুধেল গাইয়ের সমীকরণ ১৪
স্বাতী সেনাপতি

ছবিতে খবর ১৬

পশ্চিমবঙ্গ দিবসের ইতিহাস ২২
অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতপন্থী রাজনীতির তাত্ত্বিক দার্শনিক পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ২৭
বিনয়ভূষণ দাশ

বাংলায় বিজেপিই এখন মানুষের ভরসা ৩২
পল্লব মণ্ডল

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, সৌভিক দত্ত, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

একটা রাজ্যের পুলিশ কার? কোনও জমিদারের তো নয়! কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিরও নয়। কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলেরও নয়। ক্ষমতাসীন দলেরও নয়। ক্ষমতাশালী কোনও বিশেষ পরিবারেরও নয়। মানে পুলিশ কখনোই কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়। অথচ এ রাজ্যে বীরভূমের একটা ছিঁচকে গুন্ডা, নেহাতই একটা ছুঁচো যখন মা-বৌকে নিয়ে পুলিশকে গালাগালি করে তখন কেন হাত গুটিয়ে বসে থাকে মমতা-হীন নির্মম সরকারের পুলিশ? কে এর দায় নেবে? পুলিশের এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী কে?

অপারেশন সিঁদুরের পর কলকাতারই এক দেশভক্ত হিন্দু তরুণী শর্মিষ্ঠা পানোলি যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কথা বলতে বলতে বিশেষ একটি ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলেছিল তখন কলকাতা পুলিশ চটজলদি সেই তরুণীকে গুরুগ্রাম থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে। অভিযোগ করেছিল গাড্রেনরিচেড় এক খান ভাই। তাহলে কুৎসিত ভাবে হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করার পর পুলিশ কেন গ্রেফতার করেনি তৃণমূলের সাওনী ঘোষ এবং মহুয়া মৈত্রকে? একটা নয়, পুলিশে তখন অজস্র অভিযোগ হয়েছিল। ভারতবর্ষের পুলিশ তো ধর্ম দেখে কাজ করেনা! তাহলে হাত গুটিয়ে কেন সেদিন বসে ছিল মমতা-হীন নির্মম সরকারের পুলিশ? কে এর দায় নেবে? পুলিশের এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী কে?

বীরভূমের মেঠো ইঁদুর যখন মমতা সরকারের পুলিশের মা-বৌকে অপমান করে তখন পুলিশ চোঁয়া ঢেকুর তোলে। তৃণমূলের গুণ্ডা বাহিনীর সামনে প্রাণ বাঁচাতে টেবিলের তলায় ঢুকে যায়, জেহাদিদের আক্রমণের সময় দোকানের ভেতর লুকোয়, মহেশতলার ঘটনায় লুঙ্গিবাহিনীর সামনে সাদা রুমাল দেখিয়ে আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত দেয়। তৃণমূল দলের এক বিশেষ শ্রেণীর ভোটব্যাঙ্ক পুলিশকে মেরে রক্তাক্ত করলেও যে পুলিশ চুপ করে থাকে সেই পুলিশই হাতের সুখ করে নেয় বিরোধী দলের নেতাদের পিটিয়ে। বারাবনি থানার ওসি দিব্যেন্দু মুখার্জি বিজেপির শান্তিপূর্ণ ডেপুটেশনে ৭০ বছর বয়সী প্রবীণ অমল রায় বাবুর ওপর নির্মম ভাবে লাঠি চালিয়ে কি প্রমাণ করতে চায়? এটাই কি মমতা-হীন নির্মম সরকারের পুলিশের বীরত্ব! বিরোধীদের ওপর এই নির্মমতা তো দেশের গণতন্ত্রের ওপর আঘাত। বিরোধিতা তো গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ! পুলিশের কাজ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা, পেটানো তো নয়! বিরোধী হলেই মারতে হবে? হিন্দু হলেই মারতে হবে? এ রাজ্যে কি বিরোধিতা, গণতন্ত্র এবং হিন্দুদের কোনও জায়গা নেই? তৃণমূল দল একটি বিশেষ শ্রেনীর দল হতেই পারে কিন্তু সরকার তো সবার! এই সত্য তো মমতা সরকার এবং পুলিশকে মেনে নিতেই হবে। এ রাজ্যটা ভারত রাষ্ট্রের একটি প্রদেশ এবং ভারতীয় সংবিধানের বাইরে নয়।

জন্মশতবর্ষে অটল বিহারী বাজপেয়ী

❝ অটলজির অধীনে এনডিএ সরকারই প্রথম দেশের নাগরিকদের কাছে প্রযুক্তিকে সহজভাবে পৌঁছে দেওয়ার জোরালো চেষ্টা করেছিল। একই সময়ে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তকে সংযুক্ত করার জন্য ছিল তাঁর দূরদর্শিতা। আজও, বেশিরভাগ মানুষ সুবর্ণ চতুর্ভুজ প্রকল্পের কথা স্মরণ করে, যা ভারতের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থকে যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সংযুক্ত করেছিল... সাদামাটা শিকড় থেকে আসা বাজপেয়ী উপলব্ধি করেছিলেন কিভাবে সাধারণ নাগরিকের জীবনসংগ্রাম একটি সরকারের কার্যকরী শক্তিতে পরিণত হতে পারে। তাঁর নেতৃত্বের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই। তাঁর যুগ তথ্য প্রযুক্তি, টেলিকম এবং যোগাযোগের জগতে একটি বিশাল পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল ভারতে। ❞

– প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

"অটলজি ভারতে জোরালো সংস্কারের সূচনা করেছিলেন। তিনি ভারতের অর্থনৈতিক উত্থানের মঞ্চ তৈরি করেছিলেন। তিনি ছিলেন একবিংশ শতাব্দীতে ভারতের উত্তরণের স্থপতি... বাজপেয়ী সরকার শুধু অর্থনৈতিক বৃদ্ধিই বাড়ায়নি, বরং যোগাযোগের মাধ্যমে দূরবর্তী অঞ্চলগুলোকে কাছাকাছি এনেছে৷

অটল বিহারী বাজপেয়ী তাঁর দীর্ঘ সংসদীয় মেয়াদে বেশিরভাগটাই মূলত বিরোধী বেঞ্চে কাটিয়েছেন৷ কিন্তু কখনও বিরোধীদের প্রতি তিক্ততার ভাবনা ছিলনা তাঁর৷ যদিও কংগ্রেস তাঁর শেষ সীমা পর্যন্ত নীচে নেমে গিয়ে বাজপেয়ীকে 'দেশদ্রোহী' বলে অভিহিত করেছিল৷"

– প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

মোদী-শাহ ঝড়ে ভূমিকম্প বাংলায়

বিদায়বেলায় অসহায় আস্ফালন মমতা-হীন নির্মম সরকারের

জয়ন্ত গুহ

তৃণমূল সরকার এবং দলের বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদ দাঙ্গা নিয়ে মোদী-শাহের সরাসরি আক্রমণ কি আগামীদিনে বাংলায় বিরাট ভূমিকম্পের ইঙ্গিত? সিঁদুরের প্রসঙ্গ এলেই কেন জ্বলেপুড়ে উঠছেন বাংলার একদা অগ্নিকন্যা এখন প্রায় ভূত, সিঁদুর খেলার পুণ্যভূমি বাংলার 'ঘরের মেয়ে'!

২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের পর, বাংলায় বিজেপিকে নিয়ে কি ভাবছেন- এই প্রশ্নের উত্তরে বিজেপির অন্যতম জাতীয় নেতা জয় পান্ডা বলেছিলেন, "বাংলায় পার্টি ল্যান্ডিং করেছে। ক্ষমতায় আসার আগে সময় নেবে। অন্তত ৩-৪ বছর। যে কোনও অবিজেপি রাজ্যের ক্ষেত্রেই এটা সত্য। যে রাজ্যে বিজেপি কখনও ক্ষমতায় ছিলনা, সেখানে বিজেপি কখনও হঠাৎ করে ক্ষমতায় আসেনা। বিজেপি ক্ষমতায় আসে অন্তত ২০ বছরের কথা মাথায় রেখে, ৫ বছরের জন্য নয়।"

মানে মাটি তৈরির কথা বলেছিলেন। অনুকূল হাওয়ার কথা বলেছিলেন। নাহলে মাটিতে গাছ থাকবে ঠিকই কিন্তু ফলন ভাল হবেনা। মাটিতেই শুকিয়ে যাবে। তবে বীজ একবার মাটিতে পুঁতে দিলে মরেনা। শুধু এক ফোঁটা জলের অপেক্ষায় থাকে। হিন্দুত্বের বীজ খুব স্বাভাবিকভাবে এই মাটিতে আছে ১৯৪৬ থেকে। বাংলায় ২০১৯ লোকসভা নির্বাচন, ২০২১ বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে তার প্রতিফলন দেখেছি আমরা। ২০২৫-এ দাঁড়িয়ে একদা 'বাংলার বাঘ' বামেরা মহা শূন্যে ভাসছে। র্যাডিক্যাল লেফট তৃণমূল এখন একঘরে। '২৭ শতাংশের খাঁচা'-য় বন্দী বাংলার মমতা। পরাজয় নিশ্চিত জেনে আকাশভেদী হুঙ্কার। হিন্দুদের বিরুদ্ধে আক্রোশে আগুন জ্বলে উঠছে তার শিরা-উপশিরায়। স্বাভাবিক। এই হিন্দু শক্তিই তো প্রতিদিন তার ভবিষ্যৎ কেড়ে নিচ্ছে। ক্রমশ তিনি বাংলার ভূত হয়ে উঠছেন, ২০২৬-এর পর স্মৃতি হয়ে যাবেন। এমন একটা দমবন্ধ পরিস্থিতিতে আলিপুরদুয়ারে এসে নরেন্দ্র মোদী বললেন, 'অপারেশন সিঁদুর' এখনও শেষ হয়নি। অদ্ভুতভাবে এই কথায় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন সিঁদুর খেলার পুণ্যভূমি বাংলার 'ঘরের মেয়ে'! সর্ষে পোড়া দিলে ভূত যেমন ছটফট করে ওঠে তেমনি বাংলার একদা অগ্নিকন্যা এখন ভূত জ্বলেপুড়ে উঠছে। এটা ভয়ের জ্বালাপোড়া। অসহায় আর্তনাদ। পরাজয়ের ভয়।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণ শুরু করেছিলেন তেনজিং নোরগে এবং ভারতীয় সাংবাদিকতার পিতামহ রামানন্দ চ্যাটার্জির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। তিনি মনে করিয়ে দেন, বিকশিত ভারতের অংশীদার হয়ে উঠতে হবে বাংলাকে। বাংলা বিকশিত না হলে বিকশিত ভারতের পথ চলা গতি পাবেনা। মানে বলতে চাইলেন, পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতকে ঘিরে আগামীদিনে বিকশিত ভারতের যে বিপুল কর্মযজ্ঞ তাতে এখনও সামিল হয়নি বাংলা। কেন হতে পারছে না? তার

ব্যাখ্যায় তিনি বাংলার পাঁচ মহাসঙ্কটের উল্লেখ করলেন। এক, হিংসা ও অরাজকতা। দুই, মা-বোনেদের সুরক্ষা নেই। তিন, রোজগার নেই- ঘোর নিরাশায় যুবসমাজ। চার, আকাশছোঁয়া দুর্নীতি। পাঁচ, গরীবের অধিকার কেড়ে নেওয়া ক্ষমতাসীন দলের স্বার্থসিদ্ধির রাজনীতি। এত অবধি তবু ঠিক ছিল। কিন্তু এর পরই একের পর এক বোমা।

মালদা-মুর্শিদাবাদে দাঙ্গার উল্লেখ করে তিনি সরাসরি শাসকদল ও সরকারকে আক্রমণ করেন। প্রশ্ন তোলেন পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। রাখঢাক না করে বলেন, মুর্শিদাবাদে শাসকদলের বিধায়ক, কাউন্সিলারের উপস্থিতিতে বাড়ি চিহ্নিত করে জ্বালানো হয়েছে, পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। বাংলার জনতা আর ভরসা করেনা তৃণমূলের শাসন ব্যবস্থাকে, তাঁরা কোর্টের ওপর ভরসা করে। এবং তারপর খাস বাংলায় তাঁর জিজ্ঞাসা, এই ভাবে সরকার চলে কি?

প্রধানমন্ত্রীর মুখে এই কথা কিন্তু ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত বাংলার শাসকদল এবং সরকারের প্রতি। বিশ্লেষণ করলে এক লাইনে বলা যায়, সরকার চালাতে ব্যর্থ মমতা। ভেঙ্গে পড়ছে আইনশৃঙ্খলা, প্রশাসনিক এবং সাংবিধানিক কাঠামো। সর্বনাশ! মানে জরুরী অবস্থার মত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে! কি হতে চলেছে, হবে বা হচ্ছে তা তো একমাত্র সময়ই বলতে পারে।

শিক্ষা দুর্নীতি, চা বাগান বন্ধ, পিএফ দুর্নীতিতে যুক্ত দোষীদের কাউকেই যে ছেড়ে কথা বলবে না বিজেপি, সেকথা জানিয়ে আবার বোমা প্রধানমন্ত্রীর। ভরা সভায় হাড়ি ভেঙ্গে দিয়ে তিনি বলেন, এসসি-এসটি-ওবিসিদের জন্য বহু কেন্দ্রীয় সরকারি যোজনা এখানে বন্ধ করে রেখেছে রাজ্য সরকার। আয়ুষ্মান ভারত কার্ড এখানে দিতেই দেয়নি তৃণমূল সরকার। এখানে গরীবদের বাড়ি তৈরিতেও কাটমানি দাবী করছে টিএমসি সরকার। বিশ্বকর্মা যোজনার ৮ লক্ষ আবেদনপত্র পরে আছে এ রাজ্যে, যোজনা চালাতে চায়না তৃণমূল। গরীব আদিবাসী ভাই-বোনেদের বিকাশও চায়না তৃণমূল, কার্যকর করেনি জনজাতি সমাজের জন্য পিএম-জনমন যোজনা। ৯০,০০০ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের ১৬ টি বিরাট বড় পরিকাঠামোর প্রোজেক্ট (রেললাইন, মেট্রো, হাইওয়ে, হাসপাতাল) এখানে আটকে রেখেছে তৃণমূল। পিএম গ্রামসড়ক যোজনায় ৪০০০ কিমি রাস্তার কাজ গত বছর শেষ হওয়ার কথা ছিল, ৪০০ কিমি রাস্তাও তৈরি হয়নি।

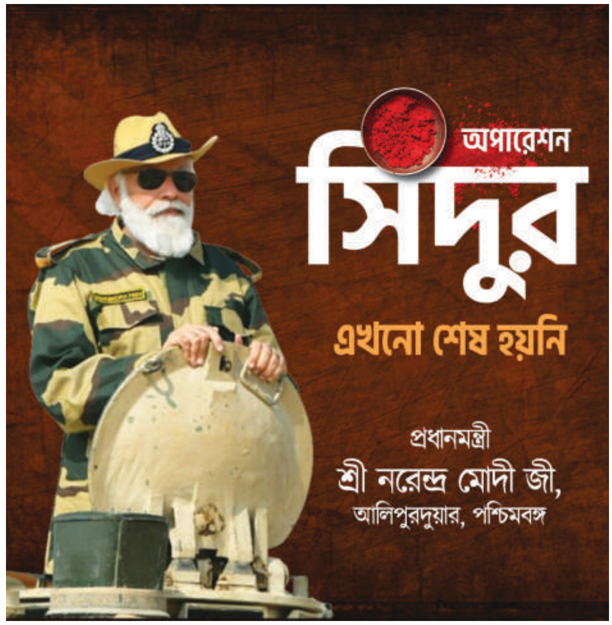

শান্ত গলায় অথচ এমন ভয়ঙ্কর মোদীকে বাংলায় আগে দেখেনি মানুষ। আর তিনি ঠিক যেখানে শেষ করেছিলেন ঠিক সেখান থেকেই কার্যকর্তা সম্মেলনে আক্রমণ শুরু অমিত শাহের। শুরু থেকেই আক্রমণ চাঁছাছোলা ভাষায়। বক্তৃতার শুরুতে জিন্দাবাদ ধ্বনি দিচ্ছিলেন কার্যকর্তারা। স্মিত হেসে তাঁর প্রথম গোলা। "জিন্দাবাদ অবশ্যই বলবেন তবে ২০২৬-এ আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণের পর বলবেন।" মুর্শিদাবাদের প্রসঙ্গে তিনি নির্দ্বিধায় বলেন, "মুর্শিদাবাদে বিএসএফ নামাতে আপত্তি করেছিল কেন্দ্র। মুর্শিদাবাদ স্টেট স্পনসর্ড দাঙ্গা। রাজ্যের মন্ত্রী মুর্শিদাবাদ হিংসায় যুক্ত"। ভাল করে ভাবুন একবার কি বললেন অমিত শাহ! 'মুর্শিদাবাদ স্টেট স্পনসর্ড দাঙ্গা'- অভিযোগ নয়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সরাসরি আরোপ যে কি সাংঘাতিক ইঙ্গিত রাজ্যের শাসকদল এবং সরকারের প্রতি সেটা নিশ্চয়ই হাড়েহাড়ে বুঝেছেন মমতা ব্যানার্জি। মানে অমিত শাহ আরও একবার দৃঢ় ভাবে ইঙ্গিত দিলেন যে এ রাজ্যে সাংবিধানিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছে। একই বিষয়ে মোদী-শাহের এই জোরালো ইঙ্গিত কি আগামীদিনে বাংলায় ভুমিকম্পের পূর্বাভাস?

হিন্দুবিরোধী মমতা ব্যানার্জির সরকার ও তৃণমূলকে অমিত শাহের সরাসরি রণহুঙ্কার, "যদি ক্ষমতা থাকে হিংসা ছাড়া নির্বাচন জিতিয়ে দেখাক মমতা ব্যানার্জী।" মানে হিংসা এবং মমতা ব্যানার্জিকে আরও একবার এক সুতোয় গেঁথে দিলেন শাহ। তবে শেষ করছেন তিনি বাংলার মানুষের কাছে যে আবেদন রেখে তাতে পরিষ্কার, দেশের সুরক্ষার স্বার্থে মাওবাদ নির্মূলের পাশাপাশি এ রাজ্যে বিজেপির ক্ষমতায় আসা লক্ষ্য নয় শুধু, জরুরী প্রয়োজন। খুব পরিষ্কার ইঙ্গিত দিয়ে শাহের আবেদন- দেশের সুরক্ষার জন্য, অনুপ্রবেশ রোখার জন্য, দুর্নীতি রুখতে, বাংলায় নারী সুরক্ষার জন্য আর সর্বোপরি হিন্দুদের সুরক্ষার জন্য বাংলায় পদ্ম ফোটান।

অপারেশন সিঁদুর

মোদীর নতুন ভারতের বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ

অভিরূপ ঘোষ

লোসভায় বক্তব্য রাখার সময় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী বলেছিলেন "সরকার আসবে, সরকার যাবে। কিন্তু এই দেশ যেন থেকে যায়।" নরেন্দ্র মোদী বুঝিয়ে দিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ীর যোগ্য উত্তরাধিকারি হয়ে দেশপ্রেমের এই পরম্পরাকে তিনি আরো অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘে সাংবাদিক সম্মেলন হচ্ছে। বক্তব্য রাখছেন পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী বিলওয়াল ভুট্টো জারদারি। ত্রেতা যুগের বস্তাপচা পদ্ধতিতে তিনি বোঝাতে চাইছেন ভারতে মুসলিমরা অত্যাচারিত এবং তাদের কোন নাগরিক অধিকার নেই। বক্তব্য শেষে শুরু হল প্রশ্নোত্তর পর্ব। প্রথম প্রশ্ন ধেয়ে এল ভারতে মুসলিমদের অবস্থান নিয়েই। এক সাংবাদিক (যিনি নিজেও মুসলিম ধর্মাবলম্বী) ভুট্টো সাহেবকে মনে করিয়ে দিলেন অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন প্রতিটি সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় সেনার পক্ষ থেকে যিনি ব্রিফিং করতে আসছিলেন তিনি একজন মুসলিম মহিলা। অন্যদিকে পাকিস্তানের ব্রিফিংয়ে অন্য ধর্মের কেউ দূরের কথা, মুসলিম ধর্মেরই কোনো মহিলাকে দূরদূরান্ত পর্যন্ত দেখা যায় নি। সাংবাদিক ভদ্রলোক এ প্রসঙ্গে ভুট্টো সাহেবের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলেন। তিনি কোনো মন্তব্য করেননি স্বাভাবিকভাবেই। আর মন্তব্য করার মত কিছু অবশিষ্টই নেই পাকিস্তানের জন্য। অপারেশন সিঁদুর রাষ্ট্র পাকিস্তানের যে নগ্নদশা উন্মুক্ত করেছে তা ঢাকা দেওয়ার ন্যূনতম কাপড়ও আজ পাকিস্তানের হাতে নেই।

পাঠক নিশ্চিতভাবে জানেন যে এপ্রিল মাসের বাইশ তারিখে জম্মু-কাশ্মীরের পেহেলগাম এলাকায় পাকিস্তান মদতপুষ্ট জঙ্গিরা ছাব্বিশ জন নিরপরাধ পর্যটককে হত্যা করে। জঙ্গিরা সেনার বেশে এসে বেছে বেছে শুধু হিন্দু পর্যটকদের গুলি করে হত্যা করে। এছাড়া কিছু মহিলার সামনেই তাঁদের স্বামীকে হত্যা করে বলা হয় 'যা গিয়ে মোদী

কে বল'। জঙ্গিদের বার্তা ছিল পরিষ্কার। রাষ্ট্র ভারত, সনাতনী ভারত তথা শ্রেষ্ঠ ভারতের কণ্ঠমূলে আঘাত করতে চেয়েছিল তারা। স্বাভাবিকভাবেই তাদের ওপর প্রত্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী ছিল। কখন, কোথায় এবং কিভাবে সেটা শক্ত দু'য়েক শুধু অজ্ঞাত ছিল আমজনতার কাছে।

এই দুই সপ্তাহে শেয়াল তৃণমূল, নেকড়ে কংগ্রেস এবং হায়না বামেরা চরম হিংস্রতায় উঠে পড়ে লেগেছিল এই সোনার দেশের ভিত্তিকে আরো নড়বড়ে করে দিতে। ওরা চেয়েছিল ভারতকে একটা দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে। ওরা চেয়েছিল স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে বাহিনী (সেনা, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী) সমন্বিতভাবে পাকিস্তান ও পাকিস্তান-অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরের ন'টি সন্ত্রাসী ঘাঁটিতে নির্ভুলভাবে আঘাত হানে। লক্ষ্য ছিল পাক অধিকৃত কাশ্মীরের পাঁচটি স্থান যথা সৈয়দনা বিলাল ক্যাম্প (মুজাফফরাবাদ), গুলপুর সন্ত্রাসী ক্যাম্প (কোটলি), সাওয়াই নালা ক্যাম্প (মুজাফফরাবাদ), মসজিদ আহল-ই-হাদিস (বার্নালা, ভিম্বর) ও মসজিদ আব্বাস (কোটলি)। পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে চারটি সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিতেও হামলা চালায় ভারতীয় বাহিনী। এগুলি হল মেহমুনা জোয়া (সিয়ালকোট), মারকাজ তাইবা (মুরিদকে), মসজিদ সুভান আল্লাহ (বাহাওয়ালপুর) এবং

ভারতের এই প্রত্যুত্তর পাক সেনা এবং আইএসআইয়ের শিরদাঁড়া কাঁপিয়ে দেয়। মোদী সরকারের আমলে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদি ট্রেনিং ক্যাম্পে হামলা আগেও হয়েছিল। কিন্তু এই প্রথমবার পাকিস্তানের মাটিতে তাদেরই মধ্যতে গড়ে ওঠা সন্ত্রাসবাদী ট্রেনিং ক্যাম্প গুড়িয়ে দিল ভারত। পাঁচজন কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী সহ প্রায় ১০০ জন সন্ত্রাসী নিহত হয় ৭ তারিখ মধ্যরাতের ওই ২৫ মিনিটের প্রত্যাঘাতে।

১. **মুদাসসার খাদিয়ান খাস (আবু জুন্দাল)** - লস্কর-ই-তইবা। মারকাজ তাইবা (মুরিদকে) থেকে লস্করের কার্যক্রম পরিচালনা করতো।

অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের পর ভুজ-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে মা-বোনেদের উষ্ণ সম্বর্ধনা।

সিঁদুর খেলার পবিত্র ভূমি পশ্চিমবঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর জনসভায় মা-বোনেদের উচ্ছ্বাস।

প্রথমবারের জন্য সিন্ধু চুক্তি থেকে বেরিয়ে এসে বিজেপি সরকার যে সাহসিকতা এবং দূরদর্শিতার নিদর্শন রেখেছিল তাকে ভুল প্রমাণ করতে। মুম্বাই জঙ্গি হামলার পরেও যারা পাকিস্তানকে আর্থিক এবং মানসিক সাহায্য দিয়েছে সেই লোকগুলোই এ যাত্রায় মোদী এবং বিজেপিকে দুর্বল দেখিয়ে রাজনৈতিক সুবিধা পেতে চেয়েছিল। কিন্তু ওরা জানত না এটা নতুন ভারত আর এই ভারতের প্রধানমন্ত্রী শয়নে স্বপনে নিজের দেশ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেও পারেন না। তাই একদিন সকালে উঠে সবাই জানতে পারল এক অভূতপূর্ব প্রত্যুত্তর পাকিস্তান এবং তাদের মদতপুষ্ট জঙ্গীরা পেয়ে গেছে। শুরু হয়ে গেছে অপারেশন সিঁদুর।

কিন্তু কিভাবে হল এই অপারেশন শুরু!

৭ তারিখ ভারতীয় সময় রাত ১:০৫ থেকে ১:৩০-এর মধ্যে মাত্র ২৫ মিনিটে তিন সিয়ালকোটের কাছে অজ্ঞাত পরিচয় একটি গ্রামের সন্ত্রাসবাদী ট্রেনিং ক্যাম্প।

প্রত্যুত্তরের এই পুরো পর্বে ভারতীয় সেনাবাহিনী সর্বোচ্চ সতর্কতা নিয়েছে যাতে করে পাকিস্তানের কোনরকম অসামরিক বা সামরিক ক্ষেত্র প্রভাবিত না হয়। যে স্ক্যাল্প মিসাইল এবং হ্যামার বোমা ব্যবহার করা হয় তা একেবারে সঠিক ঠিকানায় আঘাত করে। ফলত কোনো সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। ভারতীয় সেনা তাদের বিবৃতিতে জানাচ্ছে, "Our actions have been focused, measured and non-escalatory in nature. No Pakistani military facilities have been targeted. India has demonstrated considerable restraint in selection of targets and method of execution".

২. **হাফিজ মুহাম্মদ জামিল** - জৈশ-ই-মোহাম্মদ। সন্ত্রাসবাদী যুবকদের উগ্রপন্থীকরণ ও ভারতের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য অর্থায়নে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। মারকাজ সুভান আল্লাহ (বাহাওয়ালপুর) এর সঙ্গে যুক্ত।

৩. **মোহাম্মদ ইউসুফ আজহার (উস্তাদ জি)** - জৈশ-ই-মোহাম্মদ। ভারতে জঙ্গি কার্যকলাপের জন্য অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিত। এছাড়া কান্দাহার কাণ্ডে আইসি-৮১৪ বিমান হাইজ্যাকের সঙ্গে জড়িত।

৪. **খালিদ (আবু আকাশা)** - লস্কর-ই-তইবা। জম্মু ও কাশ্মীরে হামলা এবং অস্ত্র পাচারের সামগ্রিক পরিকল্পনায় মুখ্য ভূমিকা এর।

৫. **মোহাম্মদ হাসান খান** - পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জৈশ-ই-মোহাম্মদের কমান্ডারের পুত্র। কাশ্মীর এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যকলাপের পরিকল্পনায় যুক্ত।

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে কূটনৈতিক সফরে যাওয়া সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

অপারেশন সিঁদুরের পর চুপ করে বসে থাকলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং আইএসআই নিজেদের দেশেই তাদের গুরুত্ব হারাতো। এদিকে কংগ্রেস আমলের মত ভারতে ঢুকে বিরাট কিছু করার ক্ষমতাও তাদের ছিল না। কয়েকবার বিমান হামলার চেষ্টা করেছিল বটে কিন্তু তারা বুঝে গিয়েছিল নিশ্চিদ্র আকাশ নিরাপত্তা ভেদ করে ভারতের মাটিতে আঘাত হানা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব তারা শুরু করলো সীমান্ত জুড়ে গুলি, মর্টার এবং বোমা বর্ষণ। ঠিক যেভাবে অপারেশন সিঁদুরের সময় বেছে বেছে শুধু হিন্দুদের মারা হয়েছিল। তেমনভাবেই গুলি এবং বোমা ছোঁড়ার সময় সীমান্তের মন্দির, গুরুদুয়ারা এবং হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামগুলিকে টার্গেট করা হল। যেখানে ৭ তারিখের ভারতীয় প্রত্যুত্তরে একজনও সাধারণ পাকিস্তানি নাগরিক বা পাক সেনার মৃত্যু হয়নি (যে ১০০ জন মারা গিয়েছিল তারা শুধুমাত্র জঙ্গি সংগঠনের সদস্য) সেখানে পরের তিনদিন সীমান্তে গুলি আর বোমা চালিয়ে ১২ জন সাধারণ নাগরিক এবং একজন ভারতীয় সেনাকে হত্যা করে পাকিস্তান। জবাবে ভারতীয় সেনা পাকিস্তানের বেশকিছু সেনাঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয়। এবং এতে বেশ কিছু পাকিস্তানি সেনার মৃত্যু ঘটে। সীমান্তের গোলাগুলিতে কতজন পাকিস্তানি সেনার মৃত্যু হয়েছে সে প্রশ্ন বিরোধীরা তুলেছে বারবার। খেয়াল রাখতে হবে ভারতীয় সেনা পাকিস্তানের নৃশংস হামলার জবাব দিয়েছিল সঠিকভাবে এবং কঠোরতার সঙ্গে। কতজন পাকিস্তানি সেনা তাদের মাটিতে মারা গেছে তা গুনতে যাওয়া সেনা বা সরকারের কাজ নয় এবং তা প্রকৃত অর্থে সম্ভবও না।

সীমান্ত বরাবর গোলাগুলি চালানোর সাথে সাথে রাজধানি নতুন দিল্লি সহ ভারতের বেশকিছু জায়গায় ড্রোন এবং মিসাইল হামলার চেষ্টা করে পাকিস্তান। যদিও প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আকাশ মিসাইল সমন্বিত ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম পাকিস্তানের এই চেষ্টাকে আটকে দিতে সক্ষম হয়।

এরপরেও মে মাসের ১০ তারিখে পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর তরফে ভারতের ওপর হামলার প্রবল প্রচেষ্টা করা হয় যা ভারতীয় বায়ু সেনা প্রতিহত করে। ওইদিন রাতে ঠিক কি হয়েছিল তা নিয়ে এখনো পর্যন্ত সরকারিভাবে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। কিন্তু যাই হয়েছিল সেটা পাকিস্তানের জন্য খুব একটা সুখকর ছিল না। বাধ্য হয়ে তাই সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাব দেয় পাকিস্তান। ভারত শান্তিপ্রিয় দেশ এবং পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ ভারতের শত্রু নয়। আমাদের শত্রু শুধু পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা এবং ভারত বিরোধী কিছু সেনা এবং আইএসআইয়ের লোক। তাই সংঘর্ষবিরতির প্রস্তাব মেনে নেয় ভারত। তবে মাথায় রাখতে হবে সংঘর্ষ বিরতি চললেও অপারেশন সিঁদুর শেষ হয়নি বলে ভারত সরকার সরকারিভাবে জানিয়েছে। এরপর কি হবে তার সময় বলবে।

এখন প্রশ্ন হল অপারেশন সিদুরের প্রথম ধাপের পর পর ঠিক কি হল! পাকিস্তানের কিছু জঙ্গি ঘাটি গুঁড়িয়ে দেওয়া কি ভারতের একমাত্র সাফল্য! উত্তর হল, না। অপারেশন সিঁদুর দেখিয়ে দিল ভারতে তৈরি নিজস্ব এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম বিশ্বের যে কোন দেশের থেকে অনেক বেশি উন্নত। অপারেশন সিঁদুর দেখিয়ে দিল ভারত ঠিক কতটা নির্ভুলতা সঙ্গে শত্রু দেশে আঘাত হানতে সক্ষম। অপারেশন সিঁদুর দেখিয়ে দিল মুষ্টিমেয় কিছু বিরোধী ছাড়া গোটা রাষ্ট্র আজও এক হয়ে লড়াই করতে পিছুপা হয় না।

কিছুদিন আগেই পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে সাতটি ভারতীয় প্রতিনিধি দল যায়। এই প্রতিনিধি দলের সদস্য এবং প্রধান নির্বাচনের ক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে এক অভূতপূর্ব উদারতার পরিচয় দেয় ভারত সরকার। শশী থারুর, সলমন খুরশিদ, প্রিয়ঙ্কা চতুর্বেদী, আসাদউদ্দিন ওয়াইসি, কানিমঝি, অভিষেক ব্যানার্জি সমেত বিরোধীপক্ষের অনেকেই এই প্রতিনিধি দলের অংশ ছিল। অপারেশন সিঁদুর গোটা বিশ্বকে ভারতের সক্ষমতা নিয়ে যতটা অবাক করে দিতে পেরেছিল ঠিক ততটাই চমকে দিয়েছিল ভারতীয় গণতন্ত্রের এই সুদৃঢ় অবস্থান।

অনেক আগে সংসদে বক্তব্য রাখার সময় একদিন অটল বিহারী বাজপেয়ী বলেছিলেন "সরকার আসবে, সরকার যাবে। কিন্তু এই দেশ যেন থেকে যায়"। নরেন্দ্র মোদী বুঝিয়ে দিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ীর যোগ্য উত্তরাধিকারি হয়ে দেশপ্রেমের এই পরম্পরাকে তিনি আরো অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

অপারেশন নকশাল-মুক্ত ভারত
অবসানের দ্বারপ্রান্তে লাল সন্ত্রাস

সৌভিক দত্ত

মাওবাদী আন্দোলন আদতে কর্পোরেট-ফান্ডেড একটা বনজ সম্পদ দখলকারী সন্ত্রাসী দল ছাড়া আর কিছুই না। এছাড়াও তাদের আয়ের উৎস হিসাবে সরকারী অর্থ লুট ইত্যাদি তো আছেই। আফিম ও গাঁজা চাষ থেকেও তারা একটা বিশাল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে। ২০১১ সালে তৎকালীন সরকারের হোম মিনিস্ট্রির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভারতের মাওবাদীদের সামগ্রিক বার্ষিক রোজগার ছিল ২,০০০ কোটি!

ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সমস্যাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা বলা চলে মাওবাদী সমস্যাকে। এক সময় দেশের ৬০টিরও বেশি জেলা জুড়ে তান্ডব চালানো এই জঙ্গি কার্যক্রম আজ ২০২৫ সালে এসে ক্রমেই দুর্বল হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘোষণা ২০২৬ সালেই এই ব্যাধি নির্মূল হয়ে যাবে ভারতের বুক থেকে। সরকার যেভাবে এগিয়ে চলছে তাতে আশা করা যায় খুব তাড়াতাড়িই বাকি ভারতের সঙ্গে মূলস্রোতে মিশে উন্নয়নের পথে হাঁটতে পারবে জনজাতি ও বনবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলি।

ভারতে মাওবাদী সমস্যার উদ্ভব আজকে নয়। খাতায় কলমে বলা চলে ১৯৬৭ সাল নাগাদ পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়ি এলাকায় প্রথম জন্ম নেয় এই খতম-সন্ত্রাসের রাজনীতি। চিন থেকে তাদের হাতে আসে অস্ত্র-অর্থ এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। আবার পুলিশের হাত এড়িয়ে এই অতিবাম নেতারা দলেদলে আশ্রয় নিয়েছিল তৎকালীন চিনের বন্ধু আমেরিকায়। তাতে এদের উত্থানের পেছনে আমেরিকার হাত থাকাটাও খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। যাইহোক, সেই আমলের সরকার কঠোর হাতে তাদের দমন করে। আপাতভাবে কিছুটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় মাওবাদীরা। কিন্তু ২০০৪ সাল নাগাদ তৎকালীন দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের দৌলতে আবার মাথাচাড়া দেয় তারা। ২০০৪ সালে দুটি বড় সংগঠন People's War Group (PWG) আর MCCI (Maoist Communist Centre of India) নিজেদের মধ্যে মিশে যায়। গঠিত হয় কমিউনিষ্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মাওবাদী)। এটি ভারতের সবচেয়ে সুশৃঙ্খল, সুসজ্জিত এবং বিপজ্জনক গেরিলা সংগঠনগুলির একটি হয়ে ওঠে। আর শুরু হয় দীর্ঘ দুই দশক ব্যাপী সন্ত্রাস!

সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকার মাওবাদী সমস্যাকে আইন-শৃঙ্খলার বদলে সামাজিক

সমস্যা হিসেবেই দেখতো, যার ফলে কড়া প্রতিক্রিয়া বা সামরিক দমন প্রায়ই বিলম্বিত হত। এছাড়া আরো একটি বড় দুর্বলতা ছিল কংগ্রেস সরকারের নিজস্ব বৌদ্ধিক শিবির নেই, ফলে তারা বৌদ্ধিক স্বীকৃতির জন্য বামপন্থীদের উপরে নির্ভর করতে বাধ্য ছিল আর বামপন্থীরা স্বাভাবিকভাবেই মাওবাদীদের প্রতি নরম থাকবেই। ফলে মাওবাদীদের উপরে কখনোই পুরোমাত্রায় প্রতিরোধ নামাতে পারেনি ভারত সরকার। পরবর্তীতে নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পরে পরিস্থিতি বদলে যায়। সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাঘাত শুরু হয় মাওবাদীদের উপরে। এই সশস্ত্র আন্দোলনের বিরুদ্ধে সমন্বিত অভিযান চলে, উপদ্রুত এলাকাগুলিতে চালানো হয় ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড। কারণ কে না জানে যে দারিদ্র্যের সাথে সাথেই বাই প্রোডাক্ট হিসেবে আসে রোগ ব্যাধি, অপুষ্টি আর কমিউনিজম। আর সাথে চলে আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের পুনর্বাসন নীতির বাস্তবায়ন। ফলে সূচনা হয়েছে এক ঐতিহাসিক পালাবদলের!

এই মাওবাদীরা দারিদ্র্য দমন আর জঙ্গল রক্ষার কথা বললেও সেটা আদতে তাদের মুখোশ ছাড়া আর কিছুই না। আর সেটা প্রমাণিত হয় তাদের উপার্জনের উৎস আর পরিমাণ থেকেই। এই জঙ্গি সংগঠন এর আয়ের প্রধান উৎস "ট্যাক্স" এবং "লেভি"। সোজা বাংলায় অন্যের থেকে আদায় করা টাকা। গুন্ডারা করলে তোলা আদায় বলে, ওরা করলে ট্যাক্স ও লেভি। কিন্তু এই ট্যাক্স লেভি দেয় কারা? উন্নয়নের হাওয়া ঢুকতে না দিয়ে দারিদ্র্য জিইয়ে রাখা ওই এলাকার গরিব মানুষরা কত আর টাকা দেবে? ফলে প্রধানত টাকা আসে পুঁজিবাদী কোম্পানীগুলোর থেকে আর বাকিটা আসে বেআইনী মাইনিং থেকে।

যে কর্পোরেট কোম্পানীগুলো মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় খনন করতে রাজি হয় সরকার তাদের অনেক সস্তায় প্রায় জলের দরে খনির মালিকানা দিয়ে দেয়। তারপর সেখানে মাওবাদীরা যাতে ঝামেলা না করে তারজন্য কোম্পানিগুলি মাওবাদীদের দেয় প্রোটেকশন মানি। সোজা বাংলায় তোলা। মুসলিম শাসনে অমুসলিমদের যেমন প্রাণের বিনিময়ে দিতে হতো জিজিয়া - তেমনই। আর যে এলাকায় কর্পোরেট কোম্পানিকে ঢুকতে দেওয়া হয়না সেখানে মাওবাদীরা নিজেরা চালায় ইললিগ্যাল মাইনিং। অর্থাত পুঁজিবাদ বিরোধিতা বা বন রক্ষা নয় - মাওবাদী আন্দোলন আদতে কর্পোরেট-ফান্ডেড একটা বনজ সম্পদ দখলকারী সন্ত্রাসী দল ছাড়া আর কিছুই না। এছাড়াও তাদের আয়ের উৎস হিসাবে সরকারী অর্থ লুট ইত্যাদি তো আছেই। আফিম ও গাঁজা চাষ থেকেও তারা একটা বিশাল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে। ২০১১ সালে তৎকালীন সরকারের হোম মিনিস্ট্রির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভারতের মাওবাদীদের সামগ্রিক বার্ষিক রোজগার ছিল ২,০০০ কোটি। ভারতের রাজনীতির সেই চিরাচরিত গল্প। দরিদ্রদের জন্য লড়াই করতে করতে আন্দোলনকারীরা ধনী হয়ে যায় কিন্তু গরীব থেকে যায় গরীব হয়েই। কারণ গরীব না থাকলে তাদের দেখিয়ে আন্দোলন করে নিজেরা ধনী হবে কীভাবে?

দন্তেওয়ারায় জনজাতি সম্প্রদায়ের 'বস্তার পান্ডুম' কার্যক্রমে শ্রী অমিত শাহ।

যাইহোক, নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পরপরই শুরু হয় এই লাল ক্যান্সার দমনের প্রস্তুতি। মোদী সরকার মাওবাদী দমনের জন্য তিন-স্তরীয় কৌশল নেয় - সুরক্ষা, উন্নয়ন এবং পুরস্কার! অর্থাৎ একদিকে প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আরোও ক্ষতাশালী করা হয়, এলাকার উন্নয়নে জোর দেওয়া হয় আর আত্মসমর্পণ করা মাওবাদীদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়। ২০১৫ সালে National Policy and Action Plan-এ মাওবাদীদের বিরুদ্ধে zero tolerance" নীতি গ্রহণ করা হয়। ২০১৭-তে চালু করা হয় "সমাধান" কৌশল। স্ট্র্যাটেজি-টেকনোলজি-ইন্টেলিজেন্স সবকিছুকে একজায়গায় নিয়ে আসা হয়। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করার জন্য CRPF, BSF, ITBP, COBRA কমান্ডো ইউনিট সহ প্রায় ৭০,০০০ কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয় লাল সন্ত্রাস উপদ্রুত এলাকায়। জঙ্গলে প্রশাসনের মাটি সুদৃঢ় করার জন্য তৈরী করা হয় অসংখ্য Forward Operating Bases (FOBs)। বানানো হয় ৪০০-র বেশি fortified police stations। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বহুল পরিমাণে ব্যাহত হয়েছে মাওবাদীদের অবাধ কার্যকলাপ। মোদি সরকারের 'অপারেশন প্রহার', 'অক্টোপাস'-এর মতো গোয়েন্দা নির্ভর অভিযানে স্যাটেলাইট নজরদারি, ড্রোন ব্যবহার এবং কোবরা, ডিআরজি, গ্রেহাউন্ড, C60 ও SOG-এর যৌথ মোতায়েন কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। N S G বাহিনীকেও গড়চিরৌলিতে মোতায়েন করা হয় যা এই লড়াইয়ের গুরুত্ব ও কৌশলের পরিবর্তন নির্দেশ করে।

একইসাথে জোর দেওয়া হয়েছে পরিকাঠামোগত উন্নয়নে। কারণ অনুন্নত এলাকার মানুষদের ভুল বুঝিয়ে হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া অনেক সোজা কাজ। Special Infrastructure Scheme–এর অধীনে ৯,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। অনুমোদিত হয়েছে প্রায় ১৪,০০০ টি প্রকল্প। তৈরী হয়েছে অসংখ্য রাস্তা-স্কুল-বিদ্যুৎ সংযোগ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও টেলি কমিউনিকেশন

ব্যবস্থা। বিশেষত স্কুল নির্মাণ তো ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ পদক্ষেপ। কারণ স্থানীয় শিশুরা শিক্ষা পেলে তবেই তারা ভালো খারাপ চিনতে পারবে। আর সেই জন্য মাওবাদীদের অন্যতম টার্গেটও থাকত স্থানীয় স্কুলগুলো। ২০০৬ সালে চত্তীসগড় এর জাগরগুন্ডাতে ৫ টা স্কুল ধ্বংস করে দিয়েছিল মাওবাদীরা। পরে ২০১৯ সালে সেগুলো আবার চালু করা হয় ওই এলাকার মাওবাদী দমনের পরে। ওই রাজ্যেরই পাডমুরে মাওবাদীরা একটি ১৪ বছরের পুরনো সরকারি স্কুল ধ্বংস করেছিল, ২০১৯ সালে তা পুনরায় চালু করা হয়। দান্তেওয়াডাতেও প্রায় ১ ডজন স্কুল ধ্বংস করেছে ওরা। একই কাজ হয়েছে অন্যান্য রাজ্যেও। মোটামুটি হিসাবে বলা যায়, ২০০৬–২০১১ সালের মধ্যেই ২৬০ টি মত স্কুল ধ্বংস করেছিল তারা। যার মধ্যে ছত্তীসগড় এই ১৩১টি আর ঝাড়খন্ডে ৬৩টি টি স্কুল ছিল। PMGSY–এর মাধ্যমে প্রায় ১৭,৬০০ কিমি গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ হয়েছে। ভারতমালা প্রকল্পের আওতায় ৩৪-টি জেলা জুড়ে নির্মিত হয়েছে কয়েক লক্ষাধিক সড়ক। যেসব অঞ্চল আগে বিচ্ছিন্ন ছিল, সেগুলোকে মূলধারার সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে।

এর বাইরেও জোর দেওয়া হয়েছে জনসংযোগে। Civic Action Program–এর মাধ্যমে CAPF বাহিনী স্থানীয় গ্রামীণ উন্নয়নে অংশ নিয়েছে। এটা প্রয়োজন ছিল যাতে মানুষকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে ভুল বোঝানো না যায়। যারা যারা সারেন্ডার করেছে তাদের পুনর্বাসন প্যাকেজের সাথে দেওয়া হয়েছে নতুন জীবন। ২০২৫ সালের নতুন পুনর্বাসন নীতিতে আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের জন্য ৫০ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান, চাকরির সুযোগ ও আইনি সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেসব ইউনিট একযোগে আত্মসমর্পণ করে, তাদের জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। আত্মসমর্পণ করা প্রাক্তন মহিলা মাওবাদীদের নিয়ে তৈরী করা হয়েছে দান্তেশ্বরী ফাইটারস এর মত দল। এই বাহিনী মিশে থাকে গ্রামবাসীর সঙ্গে। ছোট ছোট অপারেশনে সাহায্য করে নিরাপত্তা বাহিনীকে। কেবল এনকাউন্টার নয়, বুঝিয়ে নকশালদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার কাজও করে এই বাহিনী। বস্তার অলিম্পিক এর মত কার্যক্রমও সাধারন মানুষকে মূল স্রোতে থাকতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ১২ জন এমন কট্টর মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছে যাদের মাথার দাম ১ কোটি টাকারও বেশি। ২৪ জন নকশাল ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় আত্মসমর্পণ করেছে এবং আরও ৩৩ জন বস্তারে নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। যাদের মধ্যে ২৪ জনের জন্য মাথার দাম ছিল ৯১ লক্ষ টাকা। গত বছর বস্তার ডিভিশনের সাতটি জেলায় মোট ৭৯২ জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করে বলে জানিয়েছে ছত্তীসগঢ় পুলিশ। এ বছর ইতিমধ্যেই সে সংখ্যা ছাপিয়ে যেতে চলেছে। এটি স্পষ্ট করে যে, মাওবাদী শিবিরে ভীতি ও হতাশা কাজ করছে, এবং বহু নেতা ও কর্মী পুনর্বাসনের পথ বেছে নিচ্ছে। মাওবাদীদের মূল স্রোতে ফেরাতে ছত্তীসগঢ় পুলিশ গত বছর 'নিয়া নার নিয়া পুলিশ' (আমাদের গ্রাম, আমাদের পুলিশ) প্রচার কর্মসূচি শুরু করেছিল। এছাড়াও গত ১৮ মাসে মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলিতে ২৮ জন মাওবাদী নিহত, ৩১ জন গ্রেপ্তার এবং ৪৪ জন আত্মসমর্পণ করেছেন, যা একটি রেকর্ড। কদিন আগেই আত্মসমর্পন করেছে তিনজন মাওবাদী। স্থানীয় কোম্পানি কমান্ডার ভীমা ওরফে দীনেশ পোড়িয়াম, পিএলজিএর প্লাটুন কমান্ডার সুকলি কোররাম ওরফে স্বপ্না এবং জনমিলিশিয়ার দেবলী মান্ডভী।

আর এর ফলেই ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়েছে লাল সন্ত্রাস। ২০২৫ সালে একাধিক শীর্ষ মাওবাদী নেতার মৃত্যু বা আত্মসমর্পণ প্রমাণ করে যে তাদের শেষের সেদিন ঘনিয়ে এসেছে। চলতি বছরে মাওবাদী পলিটব্যুরো সদস্য রামচন্দ্র রেড্ডি ওরফে চলপতি, সাধারণ সম্পাদক নাম্বালা কেশব রাও ওরফে বাসবরাজু ওরফে গগন্না, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নরসিংহচলম ওরফে সুধাকর- বস্তারের জঙ্গলে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে। বাসবরাজুকে অবুঝমাড়ে খতম করে কেন্দ্রীয় বাহিনী। তার মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছিল ২ কোটি টাকার বেশি। অবশ্য তার থেকেও বেশি মাথার দাম ছিল গণপতির, ৩ কোটির বেশি। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুধাকর এর দাম ছিল ৪৫ লক্ষ টাকা। এছাড়াও এর আগে নিহত হয়েছে মনোজ টুডু, শান্তি দেবীর মত মাওবাদী নেতারা। এই বছরের ৯ই ফেব্রুয়ারি ছত্তীসগঢ় এর বিজাপুরে ৩১ জন সন্ত্রাসীকে হত্যা করেছিল বাহিনী। এই নেতৃত্বের পতনে দলটির কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা, অস্ত্র সরবরাহ, অর্থ সংস্থান ও আদিবাসী এলাকাগুলিতে প্রভাব কমে এসেছে। বস্তার এবং কোন্ডেগাঁও জেলা দুটোতে একসময় প্রশাসন পা রাখতেও ভয় পেতো। বাসবারাজু এনকাউন্টারের পরে, কেন্দ্রীয় সরকারের সদ্য প্রকাশিত তালিকায় এই দুইটি জেলা " লেফট উইং এক্সট্রিমিজম রিজিয়ন" ট্যাগ থেকে মুক্ত হয়েছে।

বর্তমানে বলার মত নেতা টিকে আছে ভূপতি, দেবুজি, ভাস্কর ও মাধবী হিডমা এর মত জনা ১৬ মাওবাদী। তাদের নিধন হলে মাওবাদ মাটিতে মিশে যাওয়াটা হবে সময়ের অপেক্ষা মাত্র। এই পরিস্থিতিতে কোবরা (সিআরপিএফের কমান্ডো বাহিনী)- ডিআরজি (ছত্তীসগঢ়ের ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড)-বস্তার ফাইটার্স-সি ৬০ (মহারাষ্ট্র পুলিশের মাওবাদী দমন বাহিনী)-এসওজি (ওড়িশা পুলিশের মাওবাদী দমন বাহিনী)- গ্রে হাউন্ড (অন্ধ্রপ্রদেশ-তেলঙ্গানার মাওবাদী দমন বাহিনী) সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বলা যেতে পারে এটাই হয়তো লাল সন্ত্রাসের শেষ বড় গুটি। তারপরেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে ভারতের জঙ্গল মহল।

ভারতবর্ষ কখনোই চিন বা সোভিয়েত এর মত একনায়কতান্ত্রিক আদর্শকে মেনে নেবে না। এই জিনিসটা ভারতের মাটিতেই নেই। তাই মাওবাদীদের পতন হওয়াটা ছিল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। এটা অনেক আগেই হত যদি কংগ্রেস সরকার মোদি সরকারের মত কঠোর হাতে ব্যবস্থা নিতে পারতো।

পিসি-তন্ত্র
স্বৈরতন্ত্র ও দুধেল গাইয়ের সমীকরণ

স্বাতী সেনাপতি

ধীরে ধীরে এই রাজ্যে মুসলিম তোষণকে এখন প্রায় শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূল। আরও চলবে তোষণ। উপায় নেই। কারণ পিসি যে বাঘের পিঠে চেপেছে সেই বাঘের পেটে যেতেও তিনি রাজি, কিন্তু বাঘের পিঠ থেমে নামার উপায় তাঁর নেই! নামলেই ঘ্যাক।

২০১৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি। দিনটা শিবরাত্রি। 'তখন বাম নেত্রী ও অভিনেত্রী'-র একটি টুইট ভাইরাল হয়। টুইটের একটি ইলাস্ট্রেশনে বাম নেত্রী বুলাদির শিবরাত্রি পালন দেখাতে গিয়ে শিবলিঙ্গে কন্ডোম পরানোর মত একটি অত্যন্ত আপত্তিকর, ঘৃণ্য, হিন্দু ধর্ম বিরোধী ছবি দেন। যা হিন্দু ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করার মতোই। এই নিয়ে হিন্দুদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়, নিন্দার ঝড় ওঠে। ক্ষমতায় তখন রয়েছেন দুধেল গাই তত্ত্বের প্রণেতা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিন্দার ঝড় উঠলেও সেদিন কেউ সায়নীর গ্রেফতারি নিয়ে গলা ফাটায়নি। কোথাও কোনও এফআইআর হয়নি। কারণ হিন্দুরা সহনশীল জাতি। আর বাংলার সেক্যুলার হিন্দুরা তো নিজের ধর্মের অপমানকেও বাক স্বাধীনতা বলেই দাবি করে এসেছে তারও আগে ৩৪ বছরে। তাই স্বাভাবিকভাবেই সেদিন রাজ্য পুলিশ বা প্রশাসনের তরফে সায়নীকে নিয়ে কোনও তৎপরতা দেখা যায়নি। পরবর্তীতে এই সায়নীই তৃণমূলের কোল আলো করে প্রথমে যুব সভানেত্রী পরে তথাকথিত প্রগতিশীল বাম দুর্গ বলে খ্যাত যাদবপুরের তৃণমূল সাংসদ। নিজেকে বারবার ব্রাহ্মণ, হিন্দু বলে দাবি করা মুখ্যমন্ত্রীর সেদিন অবশ্য কোনও সমস্যা হয়নি সায়নীকে নিয়ে।

কাট টু ৩০ শে মে। অপারেশন সিঁদুরের সমর্থনে সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করে হরিয়ানার গুরুগ্রাম থেকে গ্রেফতার হল আইনের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী কলকাতার বাসিন্দা শর্মিষ্ঠা পানোলি। কলকাতার মিনি পাকিস্তান গার্ডেনরিচ এলাকায় ওয়াজাহাত খান নামের এক দুধেল গাই ব্যক্তির করা অভিযোগের ভিত্তিতে অতি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে কলকাতা পুলিশ। সোজা গিয়ে উপস্থিত হয় হরিয়ানায় এবং গ্রেফতার করে আনে শর্মিষ্ঠাকে। অভিযোগ শর্মিষ্ঠার ভিডিওর বক্তব্য নাকি ইসলাম ধর্মকে আঘাত করেছে, অসম্মান করেছে। পরবর্তীতে সে ক্ষমা চেয়ে ভিডিও ডিলিট করলেও নিস্তার মেলেনি। কারণ দিদি একেবারেই নিজের দুধেল গাইদের ২৭ % ভোট নষ্ট করতে চান না। গাইরা গোঁসা করলে দিদিকে ভোট দেবে কে? সামনে আসছে ২০২৬ এর বিধানসভা ভোট। এমন সময় কি নিজের 'প্রিয়তম প্রেয়সী'-কে রাগিয়ে দিলে চলে? তাই দিদির নির্দেশে পুলিশ ছুটল হরিয়ানা। হাতকড়া পরিয়ে কলকাতায় এনে প্রমাণ করে দিল 'আমি তোমাদেরই লোক'।

গোটা দেশের সিংহভাগ লোক এই স্বৈরাচারী ঘটনায় নিন্দার ঝড় তুললেও নিজের লক্ষ্যেই অবিচল থাকে পিসি সরকার। অবশেষে প্রায় সপ্তাহ খানেক পর অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে হাইকোর্ট থেকে জামিন পায় শর্মিষ্ঠা। যে মাপকাঠিতে শর্মিষ্ঠার গ্রেফতারি হয় সেই একই নিক্তিতে তো সায়নী ঘোষেরও জেলের ভাত খাওয়ার কথা। কিন্তু না সেটি হওয়ার নয়! কারণ দিদির কাছে ওই ২৭% ভোট হল সঞ্জীবনী সুধা! যার জেরে তিনি নিজের স্বৈরতন্ত্র চালাতে পারেন।

শুধুই কি সায়নী! মাস কয়েক আগে যখন তৃণমূলের বিধায়ক হুমায়ূন কবির হিন্দুদের কেটে ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন তখনও তার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

ফিরহাদ হাকিম যখন প্রকাশ্যে হিন্দুদের ধর্মান্তকরণের কথা বলে, তাদের ইসলামের পথে নিয়ে আসতে বলে তখনও পিসির মুখে কুলুপ এঁটে থাকেন। এবার উল্টোটা ভাবুন! এই কথাগুলো যদি কোনও হিন্দু ব্যক্তি, ইসলামের বিরুদ্ধে বা মুসলিমদের বিরুদ্ধে বলতেন তখন তাঁদের সঙ্গে ঠিক কি কি করতেন পিসি? শর্মিষ্ঠা পানোলির ঘটনা তার অন্যতম উদাহরণ।

পিসির দুধেল প্রীতি, স্বৈরতন্ত্রের কথা এখন অন্তত আর কারও অজানা নয়। ২৭% ভোটকে অক্ষুণ্ণ রাখতে তিনি যা করার করতে পারেন। যতদূর যাওয়ার যেতে পারেন। তাই শর্মিষ্ঠা পানোলির ঘটনাও কোনও ব্যতিক্রম বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। অবাক হতে হতে বাংলার মানুষ হয়ত আর অবাক হতেও ভুলে গেছে। তালিকায় নয়া সংযোজন মেটিয়াবুরুজ এলাকায় শিব মন্দিরে হামলা, হিন্দুদের উপর অত্যাচারের ঘটনা। তৌহিদী জনতাকে সামলাতে গিয়ে ঘটনাস্থলে ব্যাপক মার খেয়েছে পুলিশও।

কিন্তু পুলিশমন্ত্রীর কোনও হেলদোল নেই তাতে। শুধু মেটিয়াবুরজ কেন, বিগত কয়েক মাসে বাংলা দেখেছে সন্দেশখালী, মালদা, মুর্শিদাবাদের হিন্দুদের উপর জেহাদি আক্রমণ। সবটাই হয়েছে তৃণমূল সরকারের অঙ্গুলিহেলনে। মুর্শিদাবাদে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা এবং স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক, পুরসভার কাউন্সিলরের নেতৃত্বে জেহাদি তান্ডব, হিন্দু পিতা পুত্র খুন আমরা দেখেছি। কিন্তু কতজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে, কতজনের শাস্তি হয়েছে? কারও কাছে সঠিক পরিসংখ্যান নেই। কেউ বলতে পারবেন না। তার কারণ এই রাজ্যে অপরাধীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ, চার্জশিট, ধরপাকড়, শাস্তি সবই হয় ধর্ম দেখে।

থানাগুলিতে নির্দেশ দেওয়া থাকে হালকা করে পালিশ করে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। দুষ্টু ছেলেদের দুষ্টুমি মাফ করে দিতে হয় থানার অফিসারদেরও। পুলিশের কলার ধরে মারধর করলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যায় না। সাম্প্রতিক অতীতে হিন্দুদের মার খাওয়ার পাশাপাশি বারবার পুলিশের গায়েও হাত তুলেছে সংখ্যালঘু দুষ্কৃতীরা। তা সে টিকিয়াপাড়ায় উড়ন্ত লুঙ্গির দুরন্ত লাথি হোক বা লেকটাউনে ট্রাফিক পুলিশকে চড়, থাপ্পড় মারা - কিল খেয়ে কিল হজম করাই এখন দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে খাকি পোশাকধারীদের। সুচারুভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিচ্ছে তৃণমূল সরকার। ক্ষমতায় বসেই দেগঙ্গা দাঙ্গা দিয়ে যার সূত্রপাত। তারপর বিগত কিছু বছরের পরিসংখ্যান যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে এই রাজ্যে হিন্দুদের উপর জেহাদি অত্যাচারের বড় ঘটনা ঘটেছে অন্তত ১০ টি।

মালদার কলিয়াচক(২০১৬), হাওড়ার ধূলাগড় (২০১৬), বসিরহাটের বাদুড়িয়া (২০১৭), নৈহাটির হাজীনগর (২০১৮), মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা (২০২৪), মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান (২০২৫)। এগুলো শুধু কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। এছাড়াও সমাজমাধ্যমে, সংবাদমাধ্যমে চোখ রাখলে বিভিন্ন হিন্দু উৎসবকে কেন্দ্র করে হিন্দুদের বাড়িঘর ভাঙা, মন্দির লুটপাট, মূর্তি ভাঙচুর, মূর্তি পূজায় ফতোয়ার ঘটনা তো আছেই। কিন্তু প্রশ্ন হল এত সাহস পাচ্ছে কিভাবে এই দুষ্কৃতীরা। প্রশ্নটার মত উত্তরটাও খুবই সহজ। যখনই রাজনৈতিকভাবে তৃণমূল একঘরে, কোণঠাসা মনে করেছে নিজেদের তখনই পথে নামিয়েছে দুধেল সেনা। সেটা সিএএ বিরোধী আন্দোলন হোক বা ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে হোক। প্রশ্রয় দিতে দিতে তারা এতটাই উপরে উঠে গেছে যে আর পিসি চাইলেও তাদের নামাতে পারবে না। পারবে না নিজের পুলিশদের দুধেল পেটানো, গ্রেফতারির নির্দেশ দিতে। এ যেন ঠিক ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের গল্প!

কিন্তু যে মমতা বন্দোপাধ্যায় ২০০৫ সালের ৪ঠা আগষ্ট এনআরসি চেয়ে সংসদে স্পিকারের মুখে কাগজ ছুঁড়ে মেরেছিলেন সেই মমতাই কেন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এনআরসির বিরোধিতা করলেন? ১৮০ ডিগ্রি বদলের কারণটা কি? দুধেল গাইয়ের অঙ্ক। ২০১১ সালে রাজনৈতিক পালাবদলের সমীকরণ যদি খুঁটিয়ে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে ১১ এর নির্বাচনে হিন্দু ভোটের বৃহদাংশ পেলেও, মুসলিম ভোটের অনেকটাই তখনও বামেদের কুক্ষিগত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝেছিলেন এই মুসলিম ভোট পরবর্তীতে নির্ণায়ক শক্তি হয়ে উঠতে পারে বাংলার রাজনীতিতে। অতীতে এই মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক ধরে রেখেই ৩৪ বছর ক্ষমতা টিকিয়ে রেখেছিল বামেরা। তখন কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের জোট শরিক তৃণমূল। উনি বুঝেছিলেন বাড়ছে অনুপ্রবেশ, বদলাচ্ছে ডেমোগ্রাফি। মুসলিম ভোটে শক্তিশালী হয়ে উঠছে বামেরা। তাই নিজে ক্ষমতায় এসে এই মুসলিম ভোটকে নিজের দিকে টানতে মরিয়া হয়ে ওঠেন তিনি। যোগাযোগ বাড়ান মুসলিম ধর্মগুরুদের সঙ্গে। ফুরফুরা শরীফে যাওয়া আসা বাড়তে থাকে। রেজ্জাক মোল্লা, সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর মত মুসলিম নেতৃত্বকে দলে নিয়ে সংগঠন বৃদ্ধি করতে থাকেন। ক্ষমতায় বসে ধাপে ধাপে সংখ্যালঘু খাতে প্রায় পাঁচ গুণ বরাদ্দ বৃদ্ধি করেন। ২০১৬ এর আগে সেই টাকাটা ছিল প্রায় ২৪০০ কোটি। শুরু করেন ইমাম ভাতা দেওয়া। প্রথম পাঁচ বছরেই ফুরফুরা শরীফের জন্য বরাদ্দ করেন প্রায় ১০০ কোটি টাকা। ২০১১ সালে বাম পতনের পর মুসলিম সমাজও বুঝতে পারে বামেরা আর ফিরবে না। কংগ্রেসের তো প্রশ্নই নেই। এদিকে ২০১৪ সালে বিপুল জনমত নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। ধীরে ধীরে এই রাজ্যেও শক্তি বাড়াচ্ছে তারা। তাই ধীরে ধীরে সমগ্র মুসলিম সমাজ আস্থা রাখতে শুরু করে মমতাতেই। তার ফলও হাতে নাতে ২০১৬ সালে পান মমতা। বামেদের ধুয়ে মুছে সাফ করে আরও বিপুল আসন জিতে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসেন তিনি।

ভালই চলছিল পিসিতন্ত্র। কিন্তু প্রথম ধাক্কা এল ২০১৯ সালে। দেখা গেল লোকসভা ভোটে একলাফে বিজেপি পেয়েছে ১৮ টি সাংসদ। ভোট শেয়ার প্রায় ৪০%। এদিকে ১২ টি আসনে হেরে তৃণমূলের আসন দাঁড়িয়েছে ২২টি। ভোট শেয়ার ৪৩.৩%। যার মধ্যে ২৩.৩ % মুসলিম ভোট। হিন্দু ভোটের বড় অংশ সরে গেছে দেখে পিসি বুঝলেন নিজের স্বৈরতন্ত্র কায়েম রাখতে চাই দুধেল গাইদের। তার কিছুদিন পর কোনও এক মুসলিম জনসভা থেকে তিনি হুংকার দেন, "আমি নাকি মুসলিমদের তোষণ করি! বেশ করি। আরও করব। যে গরু দুধ দেয়, তার লাথি খেতে হয়।"

তারপর ধীরে ধীরে এই রাজ্যে মুসলিম তোষণকে প্রায় শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূল। কয়েকমাস পরেই আসছে বিধানসভা। তাই এখন থেকে দুধেল প্রভুদের সন্তুষ্ট রাখতে আরও বেশি বেশি করে মুর্শিদাবাদ হবে, মালদা হবে, শর্মিষ্ঠা পানোলির মত ঘটনা ঘটবে বা বলা ভালো বাড়তে থাকবে যতদিন না বাংলার মানুষ তৃণমূলকে মূল সমেত উপড়ে ফেলে দেয়। কারণ পিসি যে বাঘের পিঠে চেপেছেন সেই বাঘের পেটে যেতেও তিনি রাজি, কিন্তু বাঘের পিঠ থেমে নামার উপায় তাঁর নেই!

ছবিতে খবর

আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজীর 'পরিবর্তন সংকল্প' সভায় মানুষের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস।

মমতার সরকারকে উৎখাত করতে কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শ্রী অমিত শাহজীর 'বিজয় সংকল্প' কার্যকর্তা সম্মেলনে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব সহ জেলা ও মন্ডলের নেতৃত্বগণ।

'মোদী সরকারের ১১ বছর' শীর্ষক প্রদর্শনী উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কলকাতায় ৬নং মুরলিধর সেন লেন বিজেপি প্রধান কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী শ্রী ভূপেন্দ্র যাদব, বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার সহ বিজেপি নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

মহেশতলা-কাণ্ডের প্রতিবাদে কালীঘাটে হিন্দুবিরোধী মমতা ব্যানার্জির নির্মম সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ রাজ্য বিজেপির। মমতা পুলিশের হাতে গ্রেফতার রাজ্য সভাপতি শ্রী সুকান্ত মজুমদার ও বিজেপি নেতৃত্ব।

মহেশতলায় বিধর্মীদের হাতে মাতা তুলসীর অপমান এবং হিন্দুদের উপর ক্রমাগত আক্রমণের প্রতিবাদ জানাতে রাজভবনে মাননীয় রাজ্যপালের কাছে বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপি পরিষদীয় দল।

ছবিতে খবর

কলকাতায় স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভূমি পরিদর্শন করে সাধু-সন্তদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ।

সল্টলেক বিজেপি কার্যালয়ে বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্বগণ।

বীরভূম জেলা বুথ সশক্তিকরণ কর্মশালায় রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক শ্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার বুথ সশক্তিকরণ জেলা কর্মশালায় রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক শ্রী দীপক বর্মন, জেলা সভাপতি শ্রী অর্জুন কুমার বিশ্বাস সহ জেলা নেতৃবৃন্দ।

পুণ্যশ্লোক রাণী অহল্যা বাঈ হোলকারের ৩০০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে আলোচনা সভায় রাজ্য সভাপতি শ্রী সুকান্ত মজুমদার সহ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

পুণ্যশ্লোক রাণী অহল্যা বাঈ হোলকারের ৩০০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে জেলায় জেলায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিজেপি নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

ছবিতে খবর

বুথ সশক্তিকরণ অভিযান ও মোদী সরকারের ১১তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে জেলায় জেলায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় রাজ্য এবং জেলা নেতৃত্ব সহ কর্মীবৃন্দ।

বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে বিজেপি বোলপুর সাংগঠনিক জেলার 'নারী সম্মান যাত্রা'-য় জনপ্লাবন।

হিন্দু অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে আত্মবলিদানকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে সন্দেশখালিতে শুভেন্দু অধিকারীর শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় জনগণের উচ্ছ্বাস।

'অপারেশন সিঁদুর'-এর সাফল্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়ে হাওড়া গ্রামীণ সাংগঠনিক জেলার ১১নং ফটক বাসস্ট্যান্ড থেকে তিরঙ্গা যাত্রায় রাজ্য বিজেপি সভাপতি শ্রী সুকান্ত মজুমদার সহ জেলা নেতৃত্ব।

বুথ সশক্তিকরণ অভিযান ও মোদী সরকারের ১১তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে জেলায় জেলায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় রাজ্য এবং জেলা নেতৃত্ব সহ কর্মীবৃন্দ।

পশ্চিমবঙ্গ দিবসের ইতিহাস

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্য পূরণের জন্য ৭৬ টি বড় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৫৯ টির আয়োজন করে বাংলার কংগ্রেস কমিটি, ১২ টির আয়োজন করেছিল হিন্দু মহাসভা এবং ৫টি যৌথভাবে আয়োজিত হয়। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে ১৯৪৭-এর ২০ জুন বঙ্গীয় আইন পরিষদের পশ্চিম অংশের সদস্যরা বাংলার দ্বিখণ্ডীকরণ করে বাঙ্গালী হিন্দুর হোমল্যান্ড বা পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তাব ৫৮-২১ ভোটে পাশ করান। নেহরু একবার শ্যামাপ্রসাদকে বলেছিলেন, "আপনিও তো দেশভাগ সমর্থন করেছিলেন।" উত্তরে শ্যামাপ্রসাদ বলেন, "আপনারা ভারত ভাগ করেছেন, আর আমি পাকিস্তান ভাগ করেছি।"

মুসলিম লীগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাহ ১৯৪৬ এর ১৬ই অগাস্ট শুক্রবার পাকিস্তানের দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' ('Direct Action Day') হিসাবে পালন করার কথা বলেন। অবিভক্ত বঙ্গে তখন ছিল সুহরাওয়ার্দি-র নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সরকার। পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় রেখে ১৬ই অগাস্ট কলকাতায় মুসলিম লীগের গুন্ডারা হিন্দুদের ওপর এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হামলা নামিয়ে আনে। কয়েক হাজার হিন্দুকে হত্যাকে করা হয়, হাজার হাজার হিন্দু নারী ধর্ষিতা হন এবং হিন্দুদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করা হয়। ১৭ই অগাস্ট হিন্দুরা মুসলিম হামলা সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করে। ১৮ তারিখ বাঙ্গালীর নেতৃত্বে শিখ ও বিহারীরা কলকাতার মুসলিম মহল্লাগুলোতে এক বীভৎস প্রতিহিংসা নামিয়ে আনে এবং প্রথম দিনের ক্ষতি সুদে-আসলে পুষিয়ে নেয়। কলকাতা দাঙ্গার প্রতিশোধ নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয় নোয়াখালিতে। বর্তমান বাংলাদেশের নোয়াখালি, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জেলা নিয়ে মেঘনার বাম তীরে অবস্থিত ছিল ব্রিটিশ আমলের নোয়াখালি জেলা। তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের এই জেলাতে হিন্দুরা ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৮%। ১৯৪৬-এর ১০ই অক্টোবর কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিন উৎসবমুখর হিন্দু বাড়িগুলিতে এক ভয়ংকর বিভীষিকা নামিয়ে আনা হয়। গণহত্যা, লুঠ, গৃহে অগ্নিসংযোগ, অপহরণ, ব্যাপকহারে নারী ধর্ষণ, মহিলাদের তুলে নিয়ে গিয়ে আটক করে রাখা এবং বলপূর্বক ধর্মান্তরণ ছিল এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রাক্তন বিধায়ক মৌলানা গোলাম সারওয়ার ছিলেন এই গণহত্যার মাস্টারমাইন্ড। প্রায় দশহাজার হিন্দুকে হত্যা করা হয় নোয়াখালিতে। এর থেকেও বেশি মানুষকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয় এবং গোমাংস খেতে বাধ্য করা হয়। গোটা জেলায় এমন কোন বাড়ি ছিল না যার অন্তত একজন মহিলা ধর্ষিতা বা অপহৃতা হননি।

ভারতের সংসদের সামনে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং বি আর আম্বেদকর।

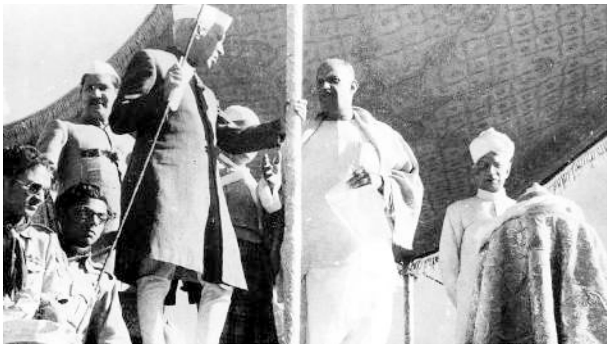
জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে শামাপ্রসাদ মুখ্যার্জি।

কলকাতার দাঙ্গা ও নোয়াখালির গণহত্যার অভিজ্ঞতা থেকে কলকাতার বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ ও শুভবুদ্ধিযুক্ত বুদ্ধিজীবীরা বুঝতে পারেন যে, হিন্দুরা শত চেষ্টা করলেও মুসলিমদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অসম্ভব- বিশেষত যেখানে মুসলিমরাই দুই বঙ্গ মিলিয়ে সংখ্যাগুরু। মুসলিম লীগ নেতৃত্ব প্রথমে কলকাতাসহ সমগ্র বাংলাকেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল। কংগ্রেসি নেতৃত্বও এই বিষয়ে কিছু মনঃস্থির করতে পারছিলেন না। কিন্তু পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তিকরণের বিরুদ্ধে বাঙ্গালী হিন্দু জনমত প্রবল থাকায় মুসলিম লীগ নেতৃত্ব অন্য চাল দেয়।

সমগ্র বাংলাকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করা অসম্ভব বুঝে মুসলিম লীগ নেতা কট্টর ধর্মান্ধ সুহরাওয়ার্দি হঠাৎ বাঙ্গালী-র ভেক ধারণ করলেন। তিনি বললেন- দুই বাংলা নিয়ে অখণ্ড বঙ্গ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হোক- যা কিনা ভারত-পাকিস্তান কোন পক্ষেই যোগদান করবে না। কিন্তু অখণ্ড বাংলাতেও বাঙ্গালী হিন্দুরা সংখ্যালঘু হত। জিন্নাহও এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে হয়ত এই অখণ্ড বঙ্গ পরবর্তীকালে পাকিস্তানে যোগদান করত। যাই হোক, সুহরাওয়ার্দির পাতা ফাঁদে পা দিলেন কংগ্রেসের দুই বর্ষীয়ান নেতা শরৎ চন্দ্র বসু ও কিরণ শঙ্কর রায়। কয়েক মাস আগে ঘটে যাওয়া কলকাতা দাঙ্গা ও নোয়াখালি গণহত্যায় সুহরাওয়ার্দির ভূমিকার কথা তাঁরা ভুলে গেলেন।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে মুহূর্তে বুঝতে পারলেন যে, বাঙ্গালী হিন্দু জাতটির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাংলাকে ভাগ করা, সেই সময় থেকেই তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করলেন বাঙ্গালী হিন্দুদের বিষয়টি বুঝিয়ে জনমত তৈরি করার জন্য। ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন এবং তিনি প্রচণ্ড বেগে সারা বাংলা চষে বেড়াতে লাগলেন এবং বড় বড় জনসভায় ভাষণ দিয়ে মানুষকে বাংলা ভাগের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে লাগলেন। তিনি কংগ্রেসের কাছে আবেদন রাখলেন যে, তারাও যেন এই দাবীকে সমর্থন জানায়। ১৯৪৭-এর ১৫ই

মার্চ কলকাতায় হিন্দু মহাসভা একটি দু'দিন ব্যাপী আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে লর্ড সিনহা, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভবতোষ ঘটক, ঈশ্বরদাস জালান, হেমেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ হিন্দু মহাসভার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য বহু মানুষও উপস্থিত হন। এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হল যে বাংলা প্রদেশের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিকে নিয়ে একটি আলাদা প্রদেশ গঠন করতে হবে। এই সভায় একটি কমিটিও গঠিত হল যাদের কাজ হবে একটি স্মারকলিপি প্রস্তুত করা যা সরকারের কাছে পেশ করা হবে।

সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি'-র ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় লেখা হয় - "সম্প্রতি বাংলার কয়েকজন নেতা, পশ্চিমবঙ্গ নামে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করে এই সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী- কারণ বাংলার লীগ শাসনাধীনে, বাঙ্গালী হিন্দুর ধন, প্রাণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, নারীর মর্যাদা বিপর্যস্ত। সম্মেলন স্বতন্ত্র পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ গঠনের দাবী জানাইতেছে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ, মেজর জেনারেল এ সি চ্যাটার্জি, ডঃ প্রমথনাথ বাঁড়ুজ্জে প্রমুখ ব্যক্তি এই আন্দোলনের কার্যকরী সমিতির সদস্য, সুতরাং চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।"

বাংলা ভাগ করা উচিত কিনা এই প্রসঙ্গে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ১৯৪৭-এর ২৩-এ মার্চ থেকে ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত একটি জনমত সমীক্ষা করে। ফলাফল ঘোষিত হয় ২৩-এ এপ্রিল। এতে মোট ৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ২৪৯ টি উত্তর আসে। এর মধ্যে ১.১% উত্তর বাতিল হয়। বাকি উত্তরের মধ্যে ৯৮.৩% বাংলা ভাগের পক্ষে ও ০.৬% বিপক্ষে মত দেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে মাত্র ০.৪% ছিল মুসলমান। অর্থাৎ, এ সময়ে বাঙ্গালী হিন্দুরা প্রায় সকলেই বাংলা ভাগের পক্ষে ছিলেন তা বোঝা যায়।

১৯৪৭-এর ২৩-এ এপ্রিল শ্যামাপ্রসাদ বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে একটি বৈঠকে তাঁকে বুঝিয়ে বলেন কেন বাংলা ভাগ করা দরকার। এই পরিকল্পনা বোঝানোর জন্য তিনি প্রচুর দলিল-দস্তাবেজ এবং মানচিত্র তৈরি করেছিলেন এবং এইগুলি বড়লাটের আপ্তসহায়ক লর্ড ইসমে-র কাছে দিয়ে আসেন। ১৯৪৭-এর মে মাসে হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস একত্রে জনসভা ডাকে যার সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য স্যর যদুনাথ সরকার। ১৯৪৭-এর ২ রা মে শ্যামাপ্রসাদ মাউন্টব্যাটেনকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। এই তথ্যনির্ভর পত্রে তিনি বাংলাভাগের পক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার করেন। এই চিঠিতে বাংলা ভাগের দাবী করে শ্যামাপ্রসাদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লেখেন যে, "Sovereign undivided Bengal will be a virtual Pakistan."

কলকাতার ব্রিটিশ মালিকানাধীন দৈনিক 'The Statesman' ১৯৪৭-এর ২৪-এ এপ্রিল "Twilight of Bengal" শিরোনামে একটি সংবাদে লেখে, গত ১০ সপ্তাহের মধ্যে বাংলা ভাগ করার আন্দোলন একটি ছোট মেঘপুঞ্জের আকার থেকে একটি বিশাল ঝড়ের আকার নিয়েছে এবং এই ঝড় পুরো প্রদেশ জুড়ে প্রবাহিত হচ্ছে, যদিও এর কেন্দ্রভূমি হচ্ছে কলকাতা। এই ঝড় আরম্ভ করেছিল হিন্দু মহাসভা।

ইতিমধ্যে শরৎ বসু ও আবুল হাশিম স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার একটি খসড়া সংবিধান তৈরি করেন। বর্ধমানের মানুষ এই আবুল হাশিম ছিলেন বাংলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারি- যিনি কলকাতা দাঙ্গার আগে খুব স্পষ্ট ভাষায় হিন্দু খুন করতে উস্কানি দিয়েছিলেন।

হিন্দুত্বের আইকন শামাপ্রসাদ মুখ্যার্জি।

ঐতিহাসিক তারকেশ্বর সম্মেলন, হিন্দু মহাসভা, ১৯৪৭।

এই খসড়া সংবিধান অনুযায়ী স্বাধীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সবসময়েই হবেন একজন মুসলিম এবং সংবিধান প্রণয়নের জন্য যে সমিতি থাকবে তাতে ৩০ জনের মধ্যে অর্ধেকের বেশি (১৬ জন) হবেন মুসলমান। অর্থাৎ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলায় হিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে রাখার একটি পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করে রাখা হয়।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এইসময় চেষ্টা করছিলেন সুহরাওয়ার্দি-বসু-হাশিম ত্রয়ীর এই ভয়ংকর পরিকল্পনাকে বানচাল করতে। ১৯৪৭ সালের মে মাসের প্রথম দিকে গান্ধী ও নেহরু-কে তিনি বাংলা ভাগের পক্ষে বললে তাঁরা খুব একটা নির্দিষ্ট করে কিছু জানান নি। ১৯৪৭-এর ১৩ই মে শ্যামাপ্রসাদ সোদপুরে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন এবং সুহরাওয়ার্দির যুক্তবঙ্গের পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চান। গান্ধী বলেন, তিনি এখনও মনঃস্থির করে উঠতে পারেন নি। শ্যামাপ্রসাদ যখন গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি বাংলা ছাড়া ভারতবর্ষকে কল্পনা করতে পারেন কি না? স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে গান্ধী এর কোন উত্তর দেন নি। কিন্তু বল্লভভাই প্যাটেল খুব দৃঢ়ভাবে শ্যামাপ্রসাদকে চিঠিতে জানান জানান যে, শ্যামাপ্রসাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, তিনি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর ভরসা রাখতে

70. Left to right : Syamaprasad, Sir P. C. Roy, Sir Manmotho Nath Mukherjee, Nirmal Chandra Chatterjee – in a protest meeting on Secondary Education Bill of Muslim League Government of Bengal on 22-12-1940.

মুসলিম লীগ সরকারের সেকেন্ডারি এডুকেশন বিলের প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, স্যর পিসি রায়, স্যর মন্মথ নাথ মুখার্জি, নির্মল চন্দ্র চ্যাটার্জি ১৯৪০।

পারেন। বাংলার হিন্দুরা যতদিন নিজেদের স্বার্থ বুঝছে এবং সেই অবস্থান থেকে না সরছে ততদিন ভয়ের কোন কারণ নেই। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার ডাক মুসলিম লীগের পাতা একটি ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই নয় এবং বাংলাকে কখনই ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

হিন্দু মহাসভা বাংলা ভাগের দাবী নিয়ে সোচ্চার হতেই কংগ্রেসিরা দেখল তাদের ভোটার যারা- সেই হিন্দুরা (বাংলার মুসলিমরা প্রায় সকলেই মুসলিম লীগের সমর্থক ছিল) তাদের নপুংসকতায় ক্ষুব্ধ হয়ে হিন্দু মহাসভার পতাকাতলে সমবেত হচ্ছে। তখনই বাংলার কংগ্রেস দল নড়েচড়ে ওঠে। তারাও তখন সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের মতামতের তোয়াক্কা না করে হিন্দু মহাসভার প্রস্তাবানুসারেই বাংলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের জন্য দুটো আলাদা মন্ত্রীসভা গঠনের দাবী তোলে ১৯৪৭-এর ৪ঠা এপ্রিল। বাংলার আঞ্চলিক কংগ্রেস নেতৃত্ব শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য মনীষীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাঙ্গালী হিন্দুর স্বার্থরক্ষায় ব্রতী হয়।

পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্য পূরণের জন্য ৭৬ টি বড় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ৫৯ টির আয়োজন করে বাংলার কংগ্রেস কমিটি, ১২ টির আয়োজন করেছিল হিন্দু মহাসভা এবং পাঁচটি যৌথভাবে আয়োজিত হয়। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে ১৯৪৭ এর ২০-এ জুন বঙ্গীয় আইন পরিষদের পশ্চিম অংশের সদস্যরা বাংলার দ্বিখণ্ডীকরণ করে বাঙ্গালী হিন্দুর হোমল্যান্ড বা পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তাব ৫৮-২১ ভোটে পাশ করান। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই কীর্তি (পশ্চিমবঙ্গ গঠনে) তাঁর জীবনীকার তথাগত রায়ের মতে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি। নেহরু একবার শ্যামাপ্রসাদকে বলেছিলেন যে, "আপনিও তো দেশভাগ সমর্থন করেছিলেন।" উত্তরে শ্যামাপ্রসাদ বলেন, "আপনারা ভারত ভাগ করেছেন, আর আমি পাকিস্তান ভাগ করেছি।" কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী রাজ্যপাল ফণিভূষণ চক্রবর্তী লিখেছেন যে, শ্যামাপ্রসাদ তাঁর সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার প্রস্তাব প্রতিরোধ করতে সমর্থ হলেন এবং দেশভাগের ভিতর আরেকটা দেশভাগ করিয়ে দিলেন।

মমতার তোষণনীতি
বিজেপি
মুখ্যমন্ত্রীর দাবি :
ওবিসি কোটার সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই
আসল সত্য :
১৭৯ টি ওবিসি শ্রেনীর মধ্যে
১২৮ টি তে মুসলিমদের সংরক্ষণ দেওয়া হয়েছে
সনাতনীদের চরম ক্ষতি
/BJP4Bengal bjpbengal.org | সূত্র: মিডিয়া রিপোর্ট

ভারতপন্থী রাজনীতির তাত্ত্বিক দার্শনিক পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়

বিনয়ভূষণ দাশ

যে জনসঙ্ঘ দীনদয়ালজী পুষ্পে পত্রে বিকশিত করেছিলেন তা এখন আর নেই; জনসঙ্ঘের উত্তরসুরী ভারতীয় জনতা পার্টি এখন কেন্দ্রের শাসক দল এবং বিভিন্ন রাজ্যেও তাঁরা শাসন করছে। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি এবং নরেন্দ্র মোদী সরকারের কল্যাণময় কর্মসূচীর সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা দীনদয়াল উপাধ্যায়জীর 'একাত্ম মানববাদ'।

ভারতীয় জনসংঘের প্রাক্তন সভাপতি পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫ শে সেপ্টেম্বর রাজস্থানের ধনকিয়া গ্রামে মাতামহ চুনিলাল শুক্লার গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ভগবতীপ্রসাদ উপাধ্যায় এবং মাতার নাম রামপ্যারী উপাধ্যায়। তাঁর জীবৎকাল মাত্রই বাহান্ন বছর। তিনি শ্রী নানাজী দেশমুখ এবং শ্রীভাউ জুগাড়ের প্রভাব ও অনুপ্রেরণায় ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘে যোগদান করেন। তিনি কানপুরের সনাতন ধর্ম কলেজ থেকে অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে স্নাতক হন। এই কলেজে তাঁর সহপাঠী ছিলেন পরবর্তীকালে জনসঙ্ঘের নেতা সুন্দরসিং ভাণ্ডারী। স্নাতকস্তরের পাঠ শেষে তিনি আগ্রার সেন্ট জন কলেজে ইংরাজি সাহিত্যে এমএ-তে ভর্তি হন এবং প্রথম বর্ষ উত্তীর্ণ হন। কিন্তু তাঁর স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশোনা সমাপ্ত করার আগেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মাধ্যমে দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করেন তিনি এবং সঙ্ঘের পূর্ণকালীন প্রচারক হিসেবে নিজেকে নিয়োগ করেন ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে।

জনসঙ্ঘের নেতাদের সঙ্গে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়।

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবন হল আদর্শবাদের সাথে সরল জীবনযাপনের এক অপূর্ব মিশেল। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ কর্মী, একজন চিন্তাবিদ এবং একজন সৃজনশীল লেখক। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ভাষণে প্রায়শ বলতেন, " Like the gentle morning dew, which falls unseen and unheard, and yet bringing into blossom the fairest of roses, has been the influence of Hinduism." পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবনে স্বামীজির এই বাণী মূর্ত হয়ে দেখা দিয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, তিলক এবং শ্রীগুরুজী মাধবরাও গোলওয়ালকরের বাণী ও রচনা দীনদয়ালজীর জীবনে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করেছে আজীবন। তিনি রাজনীতিতে এসেছিলেন দ্বিধাগ্রস্তচিত্তে। তিনি ছিলেন একজন দ্রষ্টা-ঋষি। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে যখন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারতীয় আদর্শ এবং দৃষ্টিকোণের (Indian Viewpoint) উপর ভিত্তি করে একটা রাজনৈতিক দল গঠন করতে চাইলেন এবং এই বিষয়ে শ্রীগুরুজীর (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক অধ্যাপক মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকর) সাহায্য চাইলেন তখন শ্রীগুরুজী কয়েকজন আদর্শনিষ্ঠ, কুশলী স্বয়ংসেবককে রাজনীতিক্ষেত্রে কাজ করতে পাঠালেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, অধ্যাপক বলরাজ মাধোক, সুন্দরসিং ভাণ্ডারী, অটলবিহারী বাজপেয়ী, জগদীশপ্রসাদ মাথুর ইত্যাদি নেতৃবৃন্দ।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ২১শে অক্টোবর দিল্লীতে ৫০০ জন প্রতিনিধির এক সম্মেলনে অখিল ভারতীয় জনসঙ্ঘ স্থাপিত হয়। নব প্রতিষ্ঠিত দলের প্রথম সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। নতুন এই দলের দুয়ার জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয়দের জন্য অবারিত করে দেওয়া হয়। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রথমে উত্তরপ্রদেশের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁর নিষ্ঠা ও কর্মকুশলতায় আস্থাবান ডঃ মুখোপাধ্যায় এক বৎসরের মধ্যেই পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়কে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করেন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে জুন শ্রীনগরের কারাগারে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রহস্যজনক অকালমৃত্যুর পরে দলকে সর্বভারতীয় স্তরে প্রসারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর উপর এসে পড়ে। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই দল সর্বভারতীয় পরিচিতি লাভ করে। দলের আদর্শগত ভিতও তাঁরই হাতে গড়ে ওঠে। তিনিই প্রথম ভারতে সক্রিয় অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে জনসঙ্ঘের রাজনৈতিক 'দর্শনের' তফাৎটা ব্যাখ্যা করেন।

মহাত্মা গান্ধী, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন, জিবৎরাম ভগবানদাস কৃপালানি (জে বি কৃপালানি), চৈতরাম গিদওয়ানি ইত্যাদি ভারতপন্থী নেতৃত্ব কংগ্রেস দল থেকে অপসৃত হতে বাধ্য হলে কংগ্রেস দলটি ইউরোপীয় ভাবধারা ও বামপন্থায় বিশ্বাসী জওহরলাল নেহরুর সম্পূর্ণ কব্জায় চলে যায়; দলে ভারতীয় ভাবধারা নিয়ে চর্চা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। দলটিতে ভারতীয় ভাবনা-চিন্তা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে দেশে ভারতীয় ভাবধারার উপর আধারিত রাজনৈতিক দল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা থেকেই অখিল ভারতীয় জনসঙ্ঘ স্থাপিত হয়। যদিও দল স্থাপনের তাৎক্ষণিক কারণ পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু, শিখ ও বৌদ্ধদের উপর ধর্মীয় নির্যাতন ও উদ্বাসন এবং পাকিস্তান নিয়ে নেহরুর ভুল বিদেশ নীতি। তাছাড়া কংগ্রেস দলের সঙ্গে তাঁদের চিন্তাভাবনারও মৌলিক পার্থক্য ছিল ব্যাপক। দলের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শ্রীদীনদয়াল উপাধ্যায় ১৯৬২ তে প্রকাশিত United Asia র জানুয়ারি সংখ্যায় The Jana Sangh Perspective শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'The Jana Sangh was formed as an all-India party on 21 October 1951. It was not a disgruntled, dissident, or discredited group of Congressmen who formed the nucleus of the party, as is the case with all other political parties . It was an expression of the nascent nationalism.' অবশ্য এর দুবছর আগেই শ্রীউপাধ্যায় দিল্লী থেকে প্রকাশিত রাজনৈতিক মাসিক পত্রিকা Maral-এর সম্পাদক হেক্টর অভয়বর্ধনের সাথে এক সাক্ষাতকারে বলেন, 'We should take the view that the politics of India had been moulded on foreign ideas to the neglect of Indian tradition, culture and heritage. Hence the need of a party deriving its basic inspiration from within. এটাই প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় 'দৃষ্টিকোণ' বলতে কি বোঝায় তার সঠিক ব্যাখ্যা। .

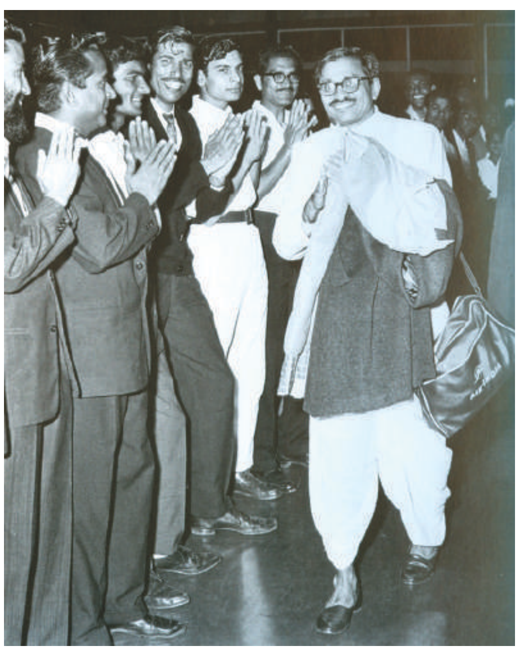

রাশিয়া সফর সেরে ভারতে ফেরার পর পণ্ডিত জী।

সেই সময়ে নেহরুবাদী রাজনীতির কারণে দেশে ক্রমবর্ধমান হতাশার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। লোকে নেহরুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসকে খুব বেশী পশ্চিমী ভাবাপন্ন এবং জাতীয় স্বার্থের বিনিময়ে পাকিস্তান ও চিনের প্রতি নরম নীতি অবলম্বন করে চলে বলে মনে করত।এই রকম এক প্রেক্ষাপটে ভারতীয় জনসঙ্ঘ স্থাপিত হয়েছিল। দলের সংগঠনের কাজ করার সাথে সাথে তিনি দলের নীতি ও আদর্শের রূপরেখা তৈরিতে মনোনিবেশ করেন। তখনও অবধি দলের কোন অর্থনৈতিক ভিত ছিল না। দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তিনি দলের অর্থনৈতিক কর্মসূচি তৈরি করেন। তিনি অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রচুর পুস্তক অধ্যয়ন করলেন। কিন্তু তাঁর প্রবর্তিত অর্থনৈতিক নীতি শুধু পুস্তকে পঠিত জ্ঞানে সীমাবদ্ধ ছিল না। এজন্য তিনি দেশের বিভিন্ন রাজ্য এবং প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করলেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা ও তার সমাধান বিষয়ে জ্ঞান

আহরণ করলেন। পুঁথিগত জ্ঞানের সাথে বাস্তবের মেলবন্ধন ঘটিয়ে দলের অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন করেন তিনি। তিনি প্রথম দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উপর ইংরাজিতে একটি পুস্তক, Two Plans: Promises, Performances, Prospects লেখেন। বইটি বিভিন্ন মহলে উচ্চপ্রশংসিত হয়েছিল। যদিও তিনি Principle and Policy এবং Devaluation: A Great Fall নামে ভারতীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনার উপর আধারিত আরও দুটি পুস্তক লিখেছিলেন। তিনি ভারতীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে মনে করতেন যে, দেশের পক্ষে 'শ্রম-অনুসারী' বা Labour-intensive অর্থনীতিই উপযোগী। দলে সংগঠনের গুরুত্ব তিনি বুঝতেন। ভারতীয় জনসঙ্ঘ এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টি একটি কর্মীভিত্তিক (cadre based) , আদর্শনিষ্ঠ দল হিসেবে পরিচিত। আর এর পুরো কৃতিত্বই পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রাপ্য।

একাত্ম মানববাদ

দীনদয়াল উপাধ্যায় বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রদেশে জনসংঘের কর্মীদের শিক্ষামুলক ক্লাশ নিয়েছিলেন। সেই সমস্ত ক্লাসে তাঁর প্রদত্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতামালা দলের বিভিন্ন প্রাদেশিক শাখা 'বিচারবীথি' নামে প্রকাশ করে। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে গোয়ালিয়রে দলের প্রতিনিধি সভায় সকলের আলোচনার জন্য পূর্বোক্ত বক্তৃতামালা “ একাত্ম মানবতাবাদ” নামে উত্থাপন করেন। ওই বছরেই অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় অনুষ্ঠিত অধিবেশনে এই দর্শন , একাত্ম মানববাদ, দলের আদর্শ হিসেবে গৃহীত হয়। প্রথমে এই বক্তৃতামালা হিন্দিতে রচিত হয়েছিল; পরবর্তীকালে ইংরাজিতে ভাষান্তরিত করে 'Integral Humanism' নামে প্রকাশিত হয়। দীনদয়ালজীর 'একাত্ম মানববাদ' তাঁর সামগ্রিক চিন্তাভাবনার সুচিন্তিত নির্যাস। তাঁর মতে, যারা কোন একটি সমস্যার কেবলমাত্র একটি দিক নিয়ে আলোচনা করে তাঁরা সত্যে উপনীত হতে পারেনা। সত্যে উপনীত হতে গেলে সামগ্রিক দৃষ্টিতে কোন বস্তুকে দেখতে হবে। ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথাই হল জীবনকে সামগ্রিকতায় দেখা এবং ব্যক্তির জীবনবোধকেও স্বীকৃতি দেওয়া । এখানে বৈচিত্র্য ও বহুমুখিতায় বিশ্বাসী সকলে। পশ্চিমী দার্শনিকেরা দ্বৈতসত্বার নীতিতে আস্থাবান। জার্মান দার্শনিক হেগেল থিসিস, অ্যান্টি-থিসিস এবং সিনথিসিসের কথা বলেছেন। কার্ল মার্ক্স এই তত্বকে অবলম্বন করেই ইতিহাস ও অর্থনীতির ব্যাখ্যা করেছেন। ডারউইন জোর দিয়েছিলেন যোগ্যতমের স্বীকৃতির উপরে। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে বৈচিত্র্যকে স্বীকার করা হয়েছে।তিনি তাঁর এই তত্বকে দাঁড় করিয়েছিলেন মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক যে এক অবিচ্ছেদ্য তারই ভিতের উপর, কেবলমাত্র সামাজিক সাম্যের উপর নয়। এই মতবাদ ব্যক্তির শারীরিক, বৌদ্ধিক এবং আর্থিক বিকাশ অর্জনের পক্ষে এক সুসংহত পন্থা। সেই সময়ে দেশে এবং বিশ্বে প্রচলিত মতবাদগুলি বিশ্লেষণ করে তিনি দেখেছেন, সমাজতন্ত্র শুধু মানুষের দেহের চাহিদার কথা বলেছে। কিন্তু মানুষকে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি, মনন অথবা আত্মা ছাড়া ভাবাই যায়না বাস্তবে। মানুষকে তাঁর এইসমস্ত বৈশিষ্টসহ সমগ্রতায় ভাবলে তবেই তাঁকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায়। আর এই সামগ্রিক চিন্তাভাবনাই হল 'একাত্ম মানবদর্শন'।

তিনি দেখেছেন, পশ্চিমের একদল দার্শনিক সমাজকে অবহেলা করে ব্যক্তিতান্ত্রিকতায় জোর দিয়েছেন; আবার মার্ক্সবাদীরা ব্যক্তিকে অবহেলা করেছেন তাঁদের দর্শনে।তাঁদের মতে, সমাজের স্বার্থ ও ব্যক্তির স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। মার্ক্সবাদীদের মতে, সমাজ নিরন্তর শ্রেণীসংঘাতের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। আর এই পারস্পরিক সংঘাতের ফলে জন্ম হয় কিছু রক্তপিপাসু একনায়কের,

ক্ষমতা দখলের পথ হয়ে ওঠে রক্তাক্ত। আবার ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থ পিপাসাই হয়ে ওঠে মানুষের একমাত্র অবলম্বন। 'একাত্ম মানববাদ' বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের কথা বলেছে।

দীনদয়ালজী দেখালেন, যদি প্রকৃতির বৈশিষ্টের দিকে লক্ষ্য করা হয় , তাহলে দেখা যায় , বিদ্বেষ ও বিরোধিতা নয়, পারস্পরিক নির্ভরতা , সৌহার্দ্য এবং একে অন্যের প্রশংসার মধ্যেই নিহিত আছে প্রকৃতির নিয়ম। উপনিষদের 'দ, দ, দ' অর্থাৎ 'দাম্যত', দত্ত, দয়দ্ধম' এই তিন 'দ' এর উপর ভিত্তি করেই আবহমান কাল ধরে প্রকৃতি চলছে। তিনি বললেন, মানুষের মৌলিক প্রয়োজন, যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এগুলির ব্যবস্থা যে কোন ভাবে করতেই হবে। কেবলমাত্র ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গই মানুষের জীবনের স্ববিরোধীতা দূর করে তাকে সার্থক করে তুলতে পারে। ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিতে তিনজন রাজনীতিবিদ তিনটি বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনের জন্ম দিয়েছেন।

মানবেন্দ্রনাথ রায় 'র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজমের' তত্ব উদ্ভাবন করেছেন, জয়প্রকাশ নারায়ণ' টোটাল রেভোলিউশন' বা 'সম্পূর্ণ ক্রান্তি'র জন্ম দিয়েছেন এবং পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় Integral Humanism বা 'একাত্ম মানববাদ'এর উদ্ভাবন করেছেন। এই মতবাদে তিনি ব্যক্তির উপর জোর দিয়েছেন। কম্যুনিস্ট দেশ যুগোস্লাভিয়ার মার্শাল টিটো রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে ব্যক্তির উপর জোর দেওয়া শুরু করেছিলেন ১৯৭৪ পরবর্তী সময়ে। এম এন রায় এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের মতে, দলবিহীন (Party less) গনতন্ত্রই পথ। ভারতবর্ষে দলবিহীন গণতন্ত্রের উদাহরণ রয়েছে 'ষোড়শ মহাজনপদের' শাসনব্যবস্থায়। ভারতীয় ব্যবস্থায় জে পির ' সম্পূর্ণ ক্রান্তি', এম এন রায়ের 'র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম' এবং দীনদয়াল উপাধ্যায়ের 'একাত্ম মানববাদ' –এর মধ্যে কোনটি বেশী প্রযোজ্য তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, দীনদয়ালজির 'একাত্ম মানববাদ' অনেক বেশী স্বয়ংসম্পূর্ণ দর্শন; এর ব্যাপ্তি অনেক বৃহত্তর। আধুনিক কালে বিভিন্ন 'চ্যালেঞ্জ'এর উত্তর হল দীনদয়ালজীর 'একাত্ম মানববাদ'। সাম্যবাদ ও পুঁজিবাদের ভারতীয় বিকল্প হল এই দর্শন। এর মূল প্রোথিত আছে অতীতে, কিন্তু এর দৃষ্টি নিবদ্ধ ভবিষ্যতে। জে পি তাঁর 'সম্পূর্ণ ক্রান্তি' বলতে সঠিক কি বোঝায় তার কোন ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা দেননি। কথাটা ভিন্ন প্রেক্ষিতে ইংল্যান্ডে ব্যবহৃত হয়েছিল।

দীনদয়ালজী তাঁর এই প্রসিদ্ধ মতবাদকে ১৯৬৫-র এপ্রিলে পুনেতে প্রদত্ত চারটি ভাষণে একটা বিধিবদ্ধ আকার প্রদান করেন। এর আগেই ১৯৬৫ র জানুয়ারীতে বিজয়ওয়াড়ায় জনসঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভায় দলে তাঁর এই মতবাদ দলের মূলগত তাত্বিক ভিত বলে গৃহীত হয়। কিন্তু ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি মোঘলসরাই স্টেশনে এক রহস্যজনক অবস্থায় তাঁর অকাল মৃত্যুতে তিনি এই তত্বের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার অবকাশ পাননি। একাত্ম মানববাদ মানুষকে তার সঠিক অবস্থানে ফিরিয়ে তাঁকে একাত্ম মানবের অংশীভূত করতে চেয়েছে। যে জনসঙ্ঘ দীনদয়ালজী পুষ্পে পত্রে বিকশিত করেছিলেন তা এখন আর নেই; জনসঙ্ঘের উত্তরসুরী ভারতীয় জনতা পার্টি এখন কেন্দ্রের শাসক দল, বিভিন্ন রাজ্যেও তাঁরা শাসন করছে। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি দীনদয়াল উপাধ্যায়জীর 'একাত্ম মানববাদ' এবং তাঁর প্রদর্শিত পথেই এগিয়ে চলেছে। তাঁর নীতি ও আদর্শ আজও সমান প্রাসঙ্গিক তা অনুধাবন করা যায় ভারতীয় জনতা পার্টির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও তার গ্রহণযোগ্যতা থেকে।

ধর্মান্তরকরণে উৎসাহ মমতা ব্যানার্জীর

ওবিসি-বি তালিকার ১৭ নম্বর পয়েন্ট:

- "যারা খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হবে তারা নিজে থেকেই OBC হিসেবে বিবেচিত হবে।"
- "তাদের বংশধররাও একই সুবিধা ভোগ করবে।"
- তাই এখন, হিন্দু ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হলে ওবিসি মর্যাদা এবং আজীবন সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে!

Category wise List of Other Backward Classes (OBC)
Recognized by Govt. of West Bengal (Notified till 03.06.2025)

Sl.	More Backward (Category-A)	Sl.	Backward (Category-B)
1	Kumbhakar	1	Kapali
2	Napit	2	Baishya Kapali
3	Yogi, Nath	3	Kurmi
4	Goala, Gope (Pallav Gope, Ballav Gope, Yadav Gope, Gope, Ahir and Yadav)	4	Sutradhar
5	Satchasi	5	Karmakar
6	Jolah (Ansari-Momin)	6	Swarnakar
7	Tanti, Tantubaya	7	Teli, Kolu
8	Dhanuk	8	Moira (Halwai), Modak (Halwai)
9	Keori / Koiri	9	Barujibi
10	Nagar	10	Malakar
11	Kahar	11	Kansari
12	Nashya-Sekh	12	Shankakar
13	Khen (Non-Bania category)	13	Raju
14	Patidar	14	Sarak
15	Sekh/Seikh	15	Tamboli / Tamali
15	Khan (Muslim)	16	Roniwar / Rauniyar
17	Muslim Molla	17	Scheduled Castes converts to Christianity and their progeny
18	Bhatia Muslim	18	Fakir, Sain
19	Muslim Mandal	19	Betkar (Bentkar)
20	Kazi/Kaji/Quazi/Quaji (Muslim)	20	Chitrakar
21	Tutia (Muslim)	21	Dhajel
22	Gazi (Muslim), Par (Muslim)	22	Newar
23	Muslim Biswas	23	Mangar
24	Baidya Muslim	24	Sampang
25	Chasatti (Chasa)	25	Thami
25	Gayen (Muslim)	26	Jogi
27	Muslim Piyada	27	Dhimal
28	Dhali (Muslim)	28	Khandait
29	Malta/Malitha/Malitya (Muslim)	29	Gangot
30	Shah (Shah/Sahaji)	30	Dhunia
31	Muslim Darji/Ostagar/Idrishi	31	Hele / Halia / Chasi-Kaibartta, Das Kaibartta
32	Muslim Dafadar	32	Sukli
33	Muslim Sardar	33	Sunuwar

মমতার ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতিতে সংকটের মুখে বাংলার সনাতনী সমাজ

/BJP4Bengal bjpbengal.org

বাংলায় বিজেপিই এখন মানুষের ভরসা

পল্লব মণ্ডল

পশ্চিমবঙ্গ দীর্ঘকাল ধরে রাজনৈতিক হিংসায় জর্জরিত। নকশালবাদের অস্থির দিনগুলিতে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের কংগ্রেস শাসনের শুরু, সিপিআই(এম)-এর শাসনের অধীনে তীব্রতর হয়ে, এখন বর্তমানে তৃণমূলের নতুন নির্লজ্জতা পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত। বাংলার নবজাগরণ চাই – সনাতন মূল্যবোধ, জাতীয়তাবাদ, নির্ভীক সত্যের পথে। রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া নয়, চাই সংস্কৃতির নবজাগরণ।

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের উপর হিংসার নতুন ঢেউ, প্রাক-দেশভাগের অস্থির সময়ের সাথে তুলনীয়, যা হিন্দু জনমানুষের মনে প্রবল আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। এই ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে 'জঙ্গলরাজ'-এর অভিযোগ তুলেছে এবং ১৯৪৬ সালের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক সহিংসতার পুনরাবৃত্তি ঘটবে কিনা, সেই উদ্বেগজনক প্রশ্ন তৈরি করেছে।

আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ, একসময় ভারতীয় নবজাগরণের পীঠস্থান এবং বিপ্লবী চেতনার উৎস হিসেবে খ্যাত ছিল, আজ রাজনৈতিক নৈরাজ্য ও গণতান্ত্রিক অবক্ষয়ের ঘূর্ণাবর্তে নিমজ্জিত। বর্তমান পরিস্থিতি কেবল বিচ্ছিন্ন আইনশৃঙ্খলার অবনতি নয়- এটি ১৯৪৬ সালের সেই বিভীষিকাময় ঘটনার এক উদ্বেগজনক প্রতিধ্বনি, যখন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' দিবসকে পরিকল্পিত গণহত্যায় পর্যবসিত হতে দিয়েছিলেন। ২০২৪-এ, উদ্বেগজনক সাদৃশ্য স্পষ্ট।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীরবতা, প্রকাশ্য তোষণনীতি এবং ভারতের সাংবিধানিক কাঠামোর প্রতি অব্যাহত অবজ্ঞা বাংলার ইতিহাসের সেই অন্ধকার অধ্যায়ের উদ্বেগজনক স্মৃতিগুলিকে উস্কে দেয়। ভ্রান্তির অবকাশ নেই, এটি আন্তঃদলীয় প্রতিযোগিতা বা আদর্শগত সংঘাতের চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাতিষ্ঠানিক সংকট, এটি অভ্যন্তরীণভাবে ভারতীয় ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পরিচালিত এক নীরব কিন্তু নির্লজ্জ যুদ্ধ। গণতান্ত্রিক পথে উত্থান হওয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সবচেয়ে সোচ্চার এবং ক্ষমাহীন নির্লজ্জ প্রতিপক্ষ। কেন্দ্রীয় আইনের প্রতি তার বারবার অবজ্ঞা, বিচারবিভাগীয় ঘোষণার প্রকাশ্য উপহাস এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পদ্ধতিগত বিপর্যয় আঞ্চলিক স্বৈরাচারের জন্য একটি বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্তমান শাসন ভারত রাষ্ট্রের ঐক্য ও অখণ্ডতার প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য অবজ্ঞা, জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে তাঁর সরকারের প্রতিরোধ এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিকে নাম পরিবর্তন করে চিত্রিত করা এসবই বিভাজনের গভীর পরিকল্পনার ইঙ্গিত দেয়।

এই রাজ্যে ওয়াকফ সংশোধনী আইন বিরোধী আন্দোলনে মুর্শিদাবাদ জেলায় বাবা-ছেলের (হরগোবিন্দ দাস, বয়স বয়স ৭২ এবং চন্দন দাস, বয়স ৪০) হত্যাকাণ্ড, যা যে কোনও সংবেদনশীল সরকারকে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করত, তা রহস্যময় নীরবতায় চাপা পড়ে যায়। সহানুভূতি বা জবাবদিহিতার পরিবর্তে, তৃণমূল কংগ্রেস তাদের চিরাচরিত কৌশল— অস্বীকার, অন্যদিকে ঘোরানো এবং demonisation-এর আশ্রয় নেয়। এমনকি তারা হাস্যকরভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীকে (বিএসএফ) এই সাম্প্রদায়িক হিংসার ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে অভিযুক্ত করে, যা পরিস্থিতিকে রাজনৈতিক রঙ দেওয়ার এবং শৃঙ্খলা রক্ষাকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠানকে কলুষিত করার চক্রান্ত।

ভুলে গেলে চলবে না, মুর্শিদাবাদের মতো হিংসাকবলিত জেলায় শান্তি ফেরাতে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে বিএসএফ মোতায়েন করা হয়েছিল। তবুও, মমতা সরকার তাদের উপস্থিতি ও ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাদের অপবাদ দেয়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর ওপর এই নিরলস আক্রমণ শুধু তুচ্ছ রাজনীতি নয়—এটি ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার পদ্ধতিগত ক্ষয়। রাজ্য সরকারগুলো যদি কেন্দ্রীয় বাহিনী, আদালত এবং আইনের বৈধতা প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করে তবে এর পরিণতি কী হবে? আমরা

পশ্চিমবঙ্গে আইনি বিচ্ছিন্নতার একটি নতুন প্যাটার্ন পরিলক্ষিত করছি, যা অত্যন্ত ভয়াবহ।

রাজনৈতিক হিংসা: বাংলার রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্য

পশ্চিমবঙ্গ দীর্ঘকাল ধরে রাজনৈতিক হিংসায় জর্জরিত। নকশালবাদের অস্থির দিনগুলিতে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের কংগ্রেস শাসনের শুরু, সিপিআই(এম) - এর শাসনের অধীনে তীব্রতর হয়ে, এখন বর্তমানে তৃণমূলের নতুন নির্লজ্জতা পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত। খেলোয়াড় বদলালেও, খেলার নিয়ম একইরকম। শুধু সরঞ্জাম ও সুবিধাভোগী ভিন্ন। আগে কংগ্রেস, তারপর সিপিএম, এখন তৃণমূল—কিন্তু তৃণমূল স্তরের হিংস্র সৈনিকরা প্রায় একই রয়ে গেছে। ক্ষমতার পরিবর্তনের সাথে তাদের আনুগত্যও বদলায়। প্রধান বিরোধী শক্তি হওয়া সত্ত্বেও বিজেপি অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা থেকে বিরত থেকেছে। সাংবিধানিক মূল্যবোধ এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি প্রায়শই দুর্বলতা হিসাবে ভুল বোঝা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত শক্তি সংযমের মধ্যে নিহিত।

ক্রমাগত উস্কানির মুখে, বিজেপি আদালত- কমিশন এবং গণআন্দোলনের মাধ্যমে কাজ করার চেষ্টা করেছে। তবে, জনগণের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙছে, এবং বাংলার ভোটাররা- বিশেষত নিপীড়িত হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ-শুধু প্রতিনিধিত্ব নয়, দৃঢ় সুরক্ষা প্রত্যাশা করছে। এই পরিস্থিতিতে, নিপীড়িত হিন্দু সমাজ বিজেপিকে তাদের উপর সহানুভূতিশীল এবং রক্ষাকর্তা হিসাবে দেখে, হিন্দু সমাজ চায় গোপাল পাঠার মত নেতৃত্ব যিনি ১৯৪৬ সালের গণহত্যায় মুসলিম লীগের উন্মত্ত জিহাদিদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য সংগঠিত করেছিল হিন্দু সমাজকে, এই প্রত্যাশা হিংসার নয়, বীরত্বের, শৌর্যের সাংবিধানিকভাবে পরিচালিত, একটি গণতান্ত্রিক প্রতিশক্তি যা নৈতিক স্পষ্টতা এবং আইনি দৃঢ়তার সাথে লড়বে।

কাটমানি, দুর্নীতি ও অপশাসন

রাজনৈতিক হিংসা বাংলার প্রাচীনতম ব্যাধি হলেও, দুর্নীতি এর সবচেয়ে ব্যাপক সংক্রামক ব্যাধি। সাম্প্রতিক ভুয়ো নিয়োগ প্রক্রিয়ার কারণে ২৫,০০০-এর বেশি শিক্ষক ও শিক্ষক কর্মীর নিয়োগ বাতিল করে সুপ্রিম কোর্ট, যা তৃণমূল সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বড় প্রমাণ। শীর্ষ আদালতের অবৈধ নিয়োগ, বেতন পুনরুদ্ধারের নির্দেশনার পরে তৃণমূল সরকারের উচিত ছিল পদত্যাগ ও জবাবদিহিতা। পরিবর্তে, যা দেখা গেল তা হল ঔদ্ধত্য,অহংকার এবং মমতার চিরাচরিত বাগাড়ম্বরপূর্ণ প্রত্যাখ্যান। "কাটমানি" শব্দটি এখন বাঙালির দৈনন্দিন শব্দভান্ডারে ঢুকে গেছে। তৃণমূল কংগ্রেস সর্বস্তরে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে হপ্তাবাজি সংস্কৃতিকে। বাড়ি তৈরি করা, দোকান খোলা বা চাকরি খোঁজা—পার্টির ক্যাডারদের ঘুষ না দিলে কিছুই হয় না। এটি একটি নিয়মতান্ত্রিক তোলাবাজি শোষণ চক্র যা দরিদ্রতমদের শিকার করে এবং রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বাংলার একসময় সমাদৃত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, তথাকথিত ভদ্রলোক,হয় এই দুর্নীতির সহযোগিতাকারী, নয়তো উদাসীন দর্শক হয়েছেন। এই এলিট শ্রেণী, যারা একসময় রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অরবিন্দের মতো নক্ষত্র তৈরি করেছিল, রাজনৈতিক সুবিধার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। কংগ্রেস থেকে কমিউনিস্ট এবং এখন তৃণমূলে, ভদ্রলোককে তাদের আনুগত্য পরিবর্তন করেছে, বিজেপিকে তাঁরা এখনও বহিরাগত শক্তি হিসাবে দেখে, উপহাস বিদ্বেষ করে, কয়েক দশকের মার্কসবাদী মতাদর্শ এবং নির্বাচনী ধর্মনিরপেক্ষতা এই শ্রেণীকে নৈতিকভাবে দেউলিয়া করে দিয়েছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্তমান শাসন ভারত রাষ্ট্রের ঐক্য ও অখণ্ডতার প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য অবজ্ঞা, জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে তাঁর সরকারের প্রতিরোধ এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিকে নাম পরিবর্তন করে চিত্রিত করা এসবই বিভাজনের গভীর পরিকল্পনার ইঙ্গিত দেয়। তাঁর মন্ত্রীরা বারবার জাতীয় নায়ক, হিন্দু প্রতীক এবং সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বারবার উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছেন। আমরা যা দেখছি তা প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়, বৈচারিক বিদ্রোহ যা রাজ্যকে ক্রমাগত ইসলামিক আগ্রাসনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

সন্দেশখালি, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ, বসিরহাট এবং অন্যান্য অসংখ্য হটস্পট এখন আইনহীনতা, সাম্প্রদায়িক তোষণ এবং অভিজাত উদাসীনতার জীবন্ত প্রমাণ। বিজেপি শাসিত কোনো রাজ্যে এমন বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে, মিডিয়া এবং নাগরিক সমাজ ঝড় তুলত। কিন্তু মমতা দায়মুক্ত হয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, তৃণমূল স্তরের কর্মী থেকে ড্রয়িংরুমের বুদ্ধিজীবী সকলেই চুপ ইকোসিস্টেমের কারণে। বিজেপি এখন শুধুমাত্র একটি বিকল্প নয়— বাংলার সভ্যতাগত অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে শেষ রক্ষাকবচ। টিএমসি-র থেকে সামান্য ভোট শেয়ার পিছিয়ে থাকা বিজেপির,গণতান্ত্রিক পুনরুত্থানের নেতৃত্ব নেওয়ার দায়িত্ব ও অধিকার তাদেরই। তবে, শুধু নির্বাচনী অঙ্ক দিয়ে এটা সম্ভব নয়। গভীর সাংস্কৃতিক সংযোগ, গণআন্দোলন এবং ন্যারেটিভের সংশোধন প্রয়োজন। বাংলার নব জাগরণ চাই – সনাতন মূল্যবোধ, জাতীয়তাবাদ, নির্ভীক সত্যের পথে। রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া নয়, চাই সংস্কৃতির নবজাগরণ। মা দুর্গার পবিত্র ভূমি থেকে সুভাষের তেজোদীপ্ত স্লোগান – বাংলা চিরকাল পথ দেখিয়েছে। সেই নেতৃত্ব আবার চাই, ভয়, বিভেদ আর মিথ্যার কবল থেকে রাজ্যকে মুক্ত করতে। সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা জাতীয়তাবাদী, বিদ্বান, কর্মী ও যুবকদের পাশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে, যারা রাজ্যকে পুনরায় দেশের গর্ব করতে চায়।

ঐতিহাসিক!
বাংলা থেকে সূচনা হচ্ছে
প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের
মাত্র ১৫ ঘন্টায় পৌঁছে যাবেন হাওড়া থেকে দিল্লি
ট্রেনের সর্বোচ্চ গতি থাকবে ১৬০ কিমি
রেলমন্ত্রক এই অর্থবর্ষে এমন ৩০টি ট্রেন চালু করার পরিকল্পনা করেছে
/BJP4Bengal
bjpbengal.org

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে কূটনৈতিক সফরে যাওয়া সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সঙ্গে নয়াদিল্লীতে নিজের বাসভবনে অন্তরঙ্গ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

মেট্রো, রেল, রাস্তা — একসাথে এগোচ্ছে বাংলা!

- ২৪৭৫ কোটি ব্যয়ে জোকা–তারাতলা মেট্রো
- ৩৩৫ কোটি ব্যয়ে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের পুনর্নবীকরণ
- বৈঁচি–শক্তিগড়, ডানকুনি–চন্দনপুর, নিমতিতা–নিউ ফরাক্কা, আমবাড়ি ফালাকাটা–নিউ ময়নাগুড়ি–গুমানিহাট রেলওয়ে লাইন সম্প্রসারণ প্রকল্পে মোট ২৩০০ কোটি টাকা ব্যয়
- হাওড়া–বর্ধমান কর্ড ও মেন লাইনে একাধিক রেল প্রকল্প
- আজিমগঞ্জ–খগড়াঘাট সড়ক দ্বিগুণকরণ কলাইকুণ্ডা–ঝাড়গ্রাম, ডানকুনি–বারুইপাড়া, রসুলপুর–মগরা লাইন সম্প্রসারণে মোট ২২৬৬ কোটি অর্থব্যয়

উপনগর থেকে মেট্রোপলিটন — রেলের যাত্রা ছুঁচ্ছে নতুন শিখর!

/BJP4Bengal bjpbengal.org

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং অঙ্কিত প্রিন্টিং হাউস, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।